সাধনা।

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

প্রথম বর্ষ।

দ্বিতীয় ভাগ।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

১২৯৯ সাল।

আগে চল্ আগে চল্ ভাই!
পড়ে' থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে,
বেঁচে মরে' কিবা ফল ভাই
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

মাসের সূচিপত্র ।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭২	৪	আলোকে।	আলোকে
২২৮	১৫	সেই	স্নেহ
৩৭৯	১৩	সঙ্গীত	সঙ্গী ও
৩৮৬	১১	ভাইরে,	বাহিরে
৪৩১	১০	জলে	স্বর্গে

গত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের সাধনায় "গোবিন্দদাস" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র "গীতগোবিন্দ" ভ্রমক্রমে এইরূপ ছাপা হইয়াছে। "গীতগোবিন্দ" না হইয়া "গতিগোবিন্দ" হইবে।

যে ভুলগুলি থাকায় অর্থবোধের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা সেইগুলি সংশোধিত হইল অন্যান্য ত্রুটি পাঠক মহাশয়েরা সংশোধন করিয়া লইবেন

সূচিপত্র।

(৸) ১

অশুদ্ধশোধন।

শ্রীযুক্ত বাবু সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের দাক্ষিণাত্যে আর্য্য উপনিবেশ প্রবন্ধের আবশ্যকীয় ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫২৮	১৯	রষ্ঠি	রঠ্‌ঠি
,,	,,	রষ্ঠ	রঠ্‌ঠ
,,	,,	মহারষ্ঠ	মহারঠ্‌ঠ
৫২৯	১১	জাতিপুগ	জাতিপুষ্প
৫৩০	৫	ও	বা
৫৩১	১৮	১৯০০ + ৪৬ = ১৯৪৬	১৯০০ + ৩৬ = ১৯৩৬
৫৩৩	১৪	ইর্ষাণাং	বর্ষাণাং
৫৩৫	৬ (নোট)	৯২৮০	৯০০০
ঐ	৭ (ঐ)	ততস্ত্রেতানুযুগ্মং	ততস্ত্রেতাযুগং
ঐ	৮ (ঐ)	স্ত্রয়ী	ত্রয়ী

সাধনা।

আদিম আর্য্য-নিবাস।

লেখাপড়া শিখিয়া আমাদের অনেকেই মা সরস্বতীর কাছে আবেদন করিয়া থাকেন

যে বিদ্যা দিয়েছ মাগো ফিরে তুমি লও,
কাগজ কলমের কড়ি আমায় ফিরে দাও।

মা সরস্বতী অনেক সময়ে তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে বিদ্যা ফিরাইয়া লন, কিন্তু কড়ি ফিরাইয়া দেন না।

অনেক বিদ্যা যাহা মাথা খুঁড়িয়া মাথার প্রবেশ করাইতে হইয়াছিল হঠাৎ নোটিস পাওয়া যায়, সেগুলা মিথ্যা, আবার মাথা খুঁড়িয়া তাহাদিগকে বাহির করা দায় হইয়া উঠে। শতদলবাসিনী যদি ইংরাজ আইনের বাধ্য হইতেন তবে উকীলের পরামর্শ লইয়া তাঁহার নিকট হইতে খেসারতের দাবী করা যাইতে পারিত। জনসমাজে লক্ষ্মীরই চাঞ্চল্য অপবাদ প্রচার হইয়াছে কিন্তু তাঁহার সপত্নীর যে নিতান্ত অটল স্বভাব এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

বাল্যকালে শিক্ষা করিয়াছিলাম মধ্য এসিয়ার কোন এক স্থানে আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থান ছিল। সেখান হইতে একদল য়ুরোপে এবং একদল ভারতবর্ষে ও পারস্যে যাত্রা করে। কতক-

গুলি আসিয়াবাসী ও য়ুরোপীয় জাতির ভাষার সাদৃশ্য দ্বারা ইহার প্রমাণ হইয়াছে।

কথাটা মনে রাখিবার একটা সুবিধা ছিল। সূর্য্য পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিমে যাত্রা করে। শ্বেতাঙ্গ আর্য্যগণও সেই পথ অনুসরণ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বাচলের কাছেও দুই একটি মলিন জ্যোতিরেখা রাখিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু উপমা যতই সুন্দর হৌক তাহাকে যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আজকাল ইংলণ্ড ফ্রান্স ও জর্ম্মানিতে বিস্তর পুরাতত্ত্ববিৎ উঠিয়াছেন, তাঁহারা বলেন য়ুরোপই আর্য্যদের আদিম বাসস্থান, কেবল একদল কোন বিশেষ কারণে এসিয়ায় আসিয়া পড়িয়াছিল।

ইহাঁদের দল প্রতিদিন যেরূপ পুষ্টিলাভ করিতেছে তাহাতে ...শ মনে হইতেছে আমাদের পুত্রপৌত্রগণ প্রাচীন আর্য্যদের সম্ব... স্বতন্ত্র পাঠ মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিবেন এবং আমাদের ধারণাকে একটা বহুকেলে ভ্রম বলিয়া অবজ্ঞা করিতে ছাড়িবেননা।

আর্য্যদিগের পশ্চিমযাত্রা সম্বন্ধে ইংলণ্ডে ল্যাথাম্ সাহেব সর্ব্বপ্রথমে আপত্তি উত্থাপন করেন।

তিনি বলেন শাখা হইতে গুঁড়ি হয় না, গুঁড়ি হইতেই শাখা হয়। য়ুরোপেই যখন অধিকাংশ আর্য্যজাতির বাসস্থান দেখা যাইতেছে তখন সহজেই মনে হয় য়ুরোপেই মোট জাতটার উদ্ভব হইয়াছে এবং পারস্য ভারতবর্ষে তাহার একটা শাখা প্রসারিত হইয়াছে মাত্র।

মার্কিন্ ভাষাতত্ত্ববিৎ হুইট্‌নি সাহেব বলেন—আর্য্যদিগের আদিম নিবাস সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান, ইতিহাস অথবা ভাষা আলোচনা দ্বারা কো... সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোন

পথ নাই। অতএব মধ্যএসিয়ায় আর্য্যদের বাসস্থান নিরূপণ করা নিতান্তই কপোলকল্পিত অনুমান।

জর্ম্মান্ পণ্ডিত বেন্‌ফি সাহেব বলেন, এসিয়াই আর্য্যদিগের প্রথম জন্মভূমি বলিয়া স্থির করিবার একটি কারণ ছিল। বহুদিন হইতে একটা সংস্কার চলিয়া আসিতেছে যে, এসিয়াতেই মানবের প্রথম উৎপত্তি হয়; অতএব আর্য্যগণ যে, সেইখান হইতেই অন্যত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে ইহার বিশেষ প্রমাণ লওয়া কেহ আবশ্যক মনে করিত না। কিন্তু ইতিমধ্যে য়ুরোপের ভূস্তরে বহু প্রাচীন মানবের বাসচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই-জন্য সেই পূর্ব্বসংস্কার এখন অমূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া ভাষাতত্ত্ব হইতে তিনি একটা বিরোধী প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই।—সংস্কৃত ও পারসিকের সহিত গ্রীক লাটিন জর্ম্মান প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষায় গার্হস্থ্য সম্পর্ক এবং অনেক পশু ও প্রাকৃতিক বস্তুর নামের ঐক্য আছে, সেই ভাষাগত ঐক্যের উপর নির্ভর করিয়াই এই ভিন্নভাষী-দিগের একজাতিত্ব স্থির হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে; নানা স্থানে বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে আর্য্যগণ যখন একত্রে বাস করিতেন, তখন তাঁহাদের কিরূপ অবস্থা ছিল ভাষা তুলনা করিয়া তাহার আভাস পাওয়া যায়। যেমন, যদি দেখা যায় সংস্কৃত ও য়ুরোপীয় ভাষায় লাঙ্গলের নামের সাদৃশ্য আছে তবে স্থির করা যায় যে আর্য্যগণ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বেই চাষ আরম্ভ করিয়া-ছিলেন, তেমনি যদি দেখা যায় কোন একটা বস্তুর নাম উভয় ভাষায় পৃথক, তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে ভিন্ন হইবার পরে তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের পরিচয় ঘটিয়াছে। সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বেন্‌ফি বলেন, সংস্কৃত ভাষায় সিংহ শব্দ যে ধাতু হইতে

উৎপন্ন হইয়াছে সে ধাতু য়ুরোপীয় কোন ভাষায় নাই। অপর পক্ষে গ্রীক্‌গণ সিংহের নাম হিব্রু ভাষা হইতে ধার করিয়া লইয়াছেন (গ্রীক লিস্, হিব্রু লাইশ্)। অতএব এ কথা বলা যাইতে পারে যে আর্য্যগণ একত্র থাকিবার সময় সিংহের পরিচয় পান নাই। সম্ভবতঃ গ্রীক্ লিস্ ও লিওন্ শব্দের ন্যায় সংস্কৃত সিংহ শব্দও তৎকালীন কোন অনার্য্য ভাষা হইতে সংগৃহীত। অথবা পশুরাজের গর্জ্জনের অনুকরণেও নূতন নামকরণ অসম্ভব নহে। যাহাই হৌক্ এসিয়াই যদি আর্য্যদিগের আদিম নিবাস হইত তবে সিংহ শব্দের ধাতু য়ুরোপীয় আর্য্য ভাষাতেও পাওয়া যাইত। উষ্ট্র হস্তী এবং ব্যাঘ্র শব্দ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

এদিকে আবার মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, শ্বেতবর্ণ মানবেরা একটি বিশেষ জাতীয় এবং এই জাতীয় মানব য়ুরোপেই দেখা যায়, এসিয়ায় নহে। প্রাচীন বর্ণনা এবং বর্ত্তমান দৃষ্টান্ত দ্বারা জানা যায় যে আদিম আর্য্যগণ শ্বেতাঙ্গ ছিলেন এবং বর্ত্তমান আর্য্যদের অধিকাংশই শ্বেতবর্ণ। অতএব য়ুরোপেই এই শ্বেতজাতীয় মনুষ্যের উৎপত্তি অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হয়।

লিওেন্‌শ্মিট্ বলেন, ভাষার ঐক্য ধরিয়া যে সমস্ত জাতিকে আর্য্য নামে অভিহিত করা হইতেছে মস্তকের গঠন ও শারীরিক পরিণতি অনুসারে তাহাদের আদিম আদর্শ য়ুরোপেই দেখা যায়। য়ুরোপীয়দের শারীরিক প্রকৃতি, দীর্ঘ জীবন এবং দুর্দ্ধর্ষ জীবনীশক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে আর্য্যজাতির প্রবলতম, প্রাচীনতম এবং গভীরতম মূল কোথায় পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহার মতে ভারতবর্ষে ও এসিয়ার অন্যত্র আর্য্যগণ তত্রস্থ আদিম অধিবাসীদের সহিত অনেক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া শঙ্কর জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

য়ুরোপের উত্তরাঞ্চলবাসী ফিন্ জাতি আর্য্যজাতি নহে। ভাষাতত্ত্ববিৎ কুনো সাহেব দেখাইয়াছেন, ফিন্ ভাষার বহুতর সংখ্যাবাচক শব্দ, সর্ব্বনাম শব্দ, এবং পারিবারিক সম্পর্কের নাম ইণ্ডোয়ুরোপীয় ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাঁহার মতে এ সকল শব্দ যে ধার করিয়া লওয়া তাহা নহে; কোন এক সময়ে অতি প্রাচীনকালে উক্ত দুই জাতির পরস্পরসামীপ্যবশত কতকগুলি শব্দ ও ধাতু উভয়েরই সরকারী দখলে ছিল। ইহা হইতেও প্রমাণ হয় য়ুরোপই আর্য্যগণের আদিম বাসস্থান, সুতরাং ফিন্ জাতি তাঁহাদের প্রতিবেশী ছিল।

ইতিমধ্যে আবার একটা নূতন কথা অল্পে অল্পে দেখা দিতেছে, সেটা যদি ক্রমে পাকিয়া দাঁড়ায় তবে আবার প্রাচীন মতই বাহাল থাকিবার সম্ভাবনা।

সেমেটিক জাতি (আরব্য য়িহুদি প্রভৃতি জাতিরা যাহার অন্তর্গত) আর্য্যজাতির দলভুক্ত নয়, এতকাল এই কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু আজকাল দুই একজন করিয়া পুরাতত্ত্ববিৎ কোন কোন সেমেটিক শব্দের সহিত আর্য্য শব্দের সাদৃশ্য বাহির করিতেছেন। এবং কেহ কেহ এরূপ অনুমান করিতেছেন যে, সেমেটিকগণ হয় ত এককালে আর্য্যজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল; সর্ব্বাগ্রে তাহারাই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এইজন্য তাহাদের সহিত অবশিষ্ট আর্য্যগণের সাদৃশ্য ক্রমশই ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে। আর্য্যদিগের সহিত সেমেটিকদের সম্পর্ক স্থির হইয়া গেলে আদিমকালে উভয়ের একত্র এসিয়াবাসই অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এ মত এখনো পরিস্ফুট হয় নাই, অনুমানের মধ্যেই আছে।

আমরা বলি, আদিম বাসস্থান যেখানেই থাক্ কুটুম্বিতা যতই

বাড়ে ততই ভাল। এই এক আর্য্য সম্পর্কে পৃথিবীর অনেক বড় বড় জাতির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বাধিয়াছে। আরবিক ও য়িহুদিরা কম লোক নহে। তাহারা যদি জাতভাই হইয়া দাঁড়ায় সে ত সুখের বিষয়। বর্ণিত আছে যে দ্রৌপদী কর্ণকে দেখিয়া মনে করিতেন "যখন আমার সেই পঞ্চস্বামীই হইল, তখন কর্ণকে সুদ্ধ ধরিয়া ছয় স্বামী হইলেই মনের খেদ মিটিত; তাহা হইলে পৃথিবীতে আমার স্বামীর তুলনা মিলিত না।" আমাদেরও কতকটা সেই অবস্থা। ইংরাজ ফরাসী গ্রীক লাটিন ইহারা ত আমাদের খুড়তুতো ভাই, এখন ইহুদি মুসলমানেরাও যদি আমাদের আপনার হইয়া যায় তাহা হইলে পৃথিবীতে আমাদের আত্মীয় গৌরবের তুলনা মিলে না। তাহা হইলে আমাদের আর্য্যমাতার প্রথমজাত এই অজ্ঞাত পুত্র কর্ণও আমাদের চিরবৈরীশ্রেণী হইতে কুটুম্বশ্রেণীতে ভুক্ত হন।

একরাত্রি।

সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি, এবং বউ বউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা আমাকে বড় যত্ন করিতেন, এবং আমাদের দুজনকে একত্র করিয়া আপনা আপনি বলাবলি করিতেন "আহা, দুটিতে বেশ মানায়!" ছোট ছিলাম কিন্তু কথাটার অর্থ একরকম বুঝিতে পারিতাম। সুরবালার প্রতি যে সর্ব্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছু বিশেষ দাবী ছিল সে ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সেই অধিকারমদে মত্ত হইয়া তাহার প্রতি যে আমি শাসন

এবং উপদ্রব না করিতাম তাহা নহে। সেও সহিষ্ণুভাবে আমার সকল রকম ফর্‌মাস্ খাটিত এবং শাস্তি বহন করিত। পাড়ায় তাহার রূপের প্রশংসা ছিল—কিন্তু বর্ব্বর বালকের চক্ষে সে সৌন্দর্য্যের কোন গৌরব ছিল না—আমি কেবল জানিতাম, সুরবালা আমারই প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এই জন্য সে আমার বিশেষরূপ অবহেলার পাত্র।

আমার পিতা চৌধুরী জমিদারের নায়েব ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল আমার হাতটা পাকিলেই আমাকে জমিদারী সেরেস্তার কাজ শিখাইয়া একটা কোথাও গোমস্তাগিরিতে প্রবৃত্ত করাইয়া দিবেন। কিন্তু আমি মনে মনে তাহাতে নারাজ ছিলাম। আমাদের পাড়ার নীলরতন যেমন কলিকাতায় পালাইয়া লেখা পড়া শিখিয়া কালেক্টার সাহেবের নাজির হইয়াছে, আমারও জীবনের লক্ষ্য সেইরূপ অত্যুচ্চ ছিল—কালেক্টারের নাজির না হইতে পারি ত জজ আদালতের হেড্ ক্লার্ক হইব ইহা আমি মনে মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। সর্ব্বদাই দেখিতাম আমার বাপ উক্ত আদালতজীবীদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন—নানা উপলক্ষ্যে মাছটা তরকারীটা টাকাটা শিকেটা লইয়া যে তাঁহাদের পূজার্চ্চনা করিতে হইত তাহাও শিশুকাল হইতে আমার জানা ছিল, এই জন্য আদালতের ছোট কর্ম্মচারী, এমন কি, পেয়াদাগুলাকে পর্য্যন্ত হৃদয়ের মধ্যে খুব একটা সম্ভ্রমের আসন দিয়াছিলাম। ইঁহারা আমাদের বাঙ্গলা দেশের পূজ্য দেবতা। তেত্রিশ কোটির ছোট ছোট নূতন সংস্করণ। বৈষয়িক সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ইঁহাদের প্রতি লোকের আন্তরিক

নির্ভর ঢের বেশি, সুতরাং পূর্ব্বে গণেশের যাহা কিছু পাওনা ছিল আজকাল ইঁহারাই তাহা সমস্ত পাইয়া থাকেন।

আমিও নীলরতনের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া এক সময় বিশেষ সুবিধাযোগে কলিকাতায় পালাইয়া গেলাম। প্রথমে গ্রামের একটি আলাপী লোকের বাসায় ছিলাম, তাহার পরে বাপের কাছ হইতেও কিছু কিছু অধ্যয়নের সাহায্য পাইতে লাগিলাম। লেখাপড়া যথানিয়মে চলিতে লাগিল।

ইহার উপরে আবার সভা সমিতিতেও যোগ দিতাম। দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণ বিসর্জ্জন করা যে, আশু আবশ্যক এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কি করিয়া উক্ত দুঃসাধ্য কাজ করা যাইতে পারে আমি জানিতাম না, এবং কেহ দৃষ্টান্তও দেখাইত না। কিন্তু তাহা বলিয়া উৎসাহের কোন ত্রুটি ছিল না। আমরা পাড়াগেঁয়ে ছেলে, ইঁচড়েপাকা কলিকাতার মত সকল জিনিষকেই পরিহাস করিতে শিখি নাই সুতরাং আমাদের নিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। আমাদের সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বক্তৃতা দিতেন, আর আমরা চাঁদার খাতা লইয়া না খাইয়া দুপুর রৌদ্রে টোটো করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা ফিরিয়া বেড়াইতাম, রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপন বিলি করিতাম, সভাস্থলে গিয়া বেঞ্চি চৌকি সাজাইতাম, দলপতির নামে কেহ একটা কথা বলিলে কোমর বাঁধিয়া মারামারি করিতে উদ্যত হইতাম। সহরের ছেলেরা এই সকল লক্ষণ দেখিয়া আমাদিগকে বাঙ্গাল বলিত।

নাজির সেরেস্তাদার হইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু মাট্‌সীনি গারিবাল্‌ডি হইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে আমার পিতা এবং সুরবালার পিতা একমত হইয়া সুরবালার সহিত আমার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইলেন। আমি পনেরো

সের বয়সের সময় কলিকাতায় পলাইয়া আসি তখন সুর-
লার বয়স ছিল আট ; এখন আমি আঠারো। পিতার মতে
মার বিবাহের বয়স ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু
দিকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আজীবন বিবাহ না
রিয়া স্বদেশের জন্য মরিব—বাপকে বলিলাম বিদ্যাভ্যাস
পূর্ণ সমাধা না করিয়া বিবাহ করিব না। দুই চারি মাসের
ধ্যে খবর পাইলাম উকীল রামলোচন বাবুর সহিত সুরবালার
বাহ হইয়া গিয়াছে। পতিত ভারতের চাঁদা আদায় কার্য্যে
স্ত ছিলাম, এ সংবাদ অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইল।

এণ্ট্রেন্স্ পাশ করিয়াছি, ফাষ্ট্ আর্ট্স্ দিব, এমন সময়
তার মৃত্যু হইল। সংসারে কেবল আমি একা নই, মাতা এবং
টি ভগিনী আছেন। সুতরাং কালেজ ছাড়িয়া কাজের সন্ধানে
ফিরিতে হইল। বহুচেষ্টায় নওয়াখালি বিভাগের একটি ছোট
সহরে এণ্ট্রেন্স্ স্কুলের সেকেণ্ড্ মাষ্টারি পদ প্রাপ্ত হইলাম।

মনে করিলাম, আমার উপযুক্ত কাজ পাইয়াছি। উপদেশ
এবং উৎসাহ দিয়া এক একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক
একটি সৈনিক করিয়া তুলিব।

কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। দেখিলাম ভাবী ভারতবর্ষ
অপেক্ষা আসন্ন এগ্জামিনের তাড়া ঢের বেশি। ছাত্রদিগকে
গ্রামার অ্যাল্‌জেব্রার বহির্ভূত কোন কথা বলিলে হেড্‌মাষ্টার
গ করে। মাসদুয়েকের মধ্যে আমারও উৎসাহ নিস্তেজ
হইয়া আসিল। আমাদের মত প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া
নানা রূপ কল্পনা করে, অবশেষে কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে
লাঙ্গল বহিয়া পশ্চাৎ হইতে ল্যাজমলা খাইয়া নতশিরে
হিষ্ণু ভাবে প্রাত্যহিক মাটিভাঙ্গার কাজ করিয়া সন্ধ্যাবেলায়

একপেট জাব্‌না খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে, লক্ষে ঝ
আর উৎসাহ থাকে না।

অগ্নিদাহের আশঙ্কায় একজন করিয়া মাষ্টার স্কুলের ঘ
তেই বাস করিত। আমি একা মানুষ, আমার উপরেই
ভার পড়িয়াছিল। স্কুলের বড় আটচালার সংলগ্ন একটি চাল
আমি বাস করিতাম। স্কুলঘরটি লোকালয় হইতে কিছু দূ
একটি বড় পুষ্করিণীর ধারে। চারিদিকে সুপারি নারিবে
এবং মাদারের গাছ, এবং স্কুল গৃহের প্রায় গায়েই দুটা প্রক
বৃদ্ধ নিমগাছ গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া ছায়া দান করিতেছে।

একটা কথা এতদিন উল্লেখ করি নাই, এবং এতদিন উল্লে
যোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। এখানকার সরকারী উকি
রামলোচন রায়ের বাসা আমাদের স্কুল ঘরের অনতিদূরে। এব
তাঁহার সঙ্গে যে তাঁহার স্ত্রী—আমার বাল্যসখী সুরবালা—ছি
তাহা আমার জানা ছিল।

রামলোচন বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হইল। সুরবালার
সহিত বাল্যকালে আমার জানাশোনা ছিল, তাহা রামলোচন
বাবু জানিতেন কি না জানি না, আমিও নূতন পরিচয়ে সে সম্বন্ধে
কোন কথা বলা সঙ্গত বোধ করিলাম না। এবং সুরবালা,
যে, কোন কালে আমার জীবনের সঙ্গে কোনরূপে জড়িত ছিল
সে কথা আমার ভাল করিয়া মনে উদয় হইত না।

একদিন ছুটির দিনে রামলোচন বাবুর বাসায় তাঁহার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। মনে নাই কি বিষয়ে আলোচনা হই-
তেছিল, বোধ করি বর্ত্তমান ভারতবর্ষের দুরবস্থা সম্বন্ধে। তিনি
যে সে জন্য বিশেষ চিন্তিত এবং ম্রিয়মাণ ছিলেন তাহা নহে,
কিন্তু বিষয়টা এমন যে, তামাক টানিতে টানিতে এ সম্বন্ধে ঘণ্টা

থানেক দেড়েক অনর্গল সখের দুঃখ করা যাইতে পারে। এমন-সময় পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটু চুড়ির টুংটাং কাপড়ের একটুখানি খস্‌খস্ এবং পায়েরও একটুখানি শব্দ শুনিতে পাইলাম; বেশ বুঝিতে পারিলাম জানালার ফাঁক দিয়া কোন কৌতূহল-পূর্ণনেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। তৎক্ষণাৎ দু'খানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল—বিশ্বাস, সরলতা এবং শৈশব প্রীতিতে ঢলঢল দু'খানি বড় বড় চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি। সহসা হৃৎপিণ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টির দ্বারা চাপিয়া ধরিল, এবং বেদনায় ভিতরটা টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।

বাসায় ফিরিয়া আসিলাম কিন্তু সেই ব্যথা লাগিয়া রহিল। লিখি পড়ি যাহা করি কিছুতে মনের ভার দূর হয় না; মনটা সহসা একটা বৃহৎ বোঝার মত হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলায় একটু স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমনটা হইল কেন? মনের মধ্যে হইতে উত্তর আসিল, তোমার সে সুরবালা কোথায় গেল! আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম—আমি ত তাহাকে ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। সে কি চিরকাল আমার জন্যে বসিয়া থাকিবে!—মনের ভিতরে কে বলিল—তখন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিতে এখন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারটুকুও পাইবে না! সেই শৈশবের সুরবালা তোমার যত কাছেই থাকুক্, তাহার চুড়ির শব্দ শুনিতে পাও, তাহার মাথাঘষার গন্ধ অনুভব কর, কিন্তু মাঝখানে বরাবর একখানি করিয়া দেয়াল থাকিবে। আমি বলিলাম তা থাক্ না, সুরবালা আমার কে!—উত্তর শুনিলাম, সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়, কিন্তু সুরবালা তোমার কি না হইতে পারিত!

সে কথা সত্য। সুরবালা আমার কি না হইতে পারিত? আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী, আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখভাগিনী হইতে পারিত, সে আজ এত দূর, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ! আর, একটা রামলোচন কোথাও কিছু নাই হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত; কেবল গোটাদুয়েক মুখস্থ মন্ত্র পড়িয়া সুরবালাকে পৃথিবীর আর সকলের নিকট হইতে এক মুহূর্ত্তে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।

আমি মানবসমাজে নূতন নীতি প্রচার করিতে বসি নাই, সমাজ ভাঙ্গিতে আসি নাই, বন্ধন ছিঁড়িতে চাই না। আমি আমার মনের প্রকৃত ভাবটা ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। আপন মনে যে সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বিবেচনা-সঙ্গত! রামলোচনের গৃহভিত্তির আড়ালে যে সুরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া আমার এ কথা আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না। এরূপ চিন্তা নিতান্ত অসঙ্গত এবং অন্যায় তাহা স্বীকার করি কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।

এখন হইতে আর কোন কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারি না। দুপুর বেলায় ক্লাশে যখন ছাত্রেরা গুন্‌গুন্ করিতে থাকিত, বাহিরে সমস্ত ঝাঁ ঝাঁ করিত, ঈষৎ উত্তপ্ত বাতাসে নিমগাছের পুষ্পমঞ্জরীর সুগন্ধ বহন করিয়া আনিত, তখন ইচ্ছা করিত— কি ইচ্ছা করিত জানি না এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি ভারতবর্ষের এই সমস্ত ভাবী আশাস্পদদিগের ব্যাকরণের ভ্রম সংশোধন করিয়া জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করিত না।

স্কুলের ছুটি হইয়া গেলে আমার বৃহৎ ঘরে একলা থাকিতে

মনকেও না, অথচ কোন ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিলেও অসবোধ হইত। সন্ধ্যাবেলায় পুষ্করিণীর ধারে সুপারি নারিকেলে অর্থহীন মর্ম্মর ধ্বনি শুনিতে শুনিতে ভাবিতাম, মনুষ্যসম একটা জটিল ভ্রমের জাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে কারো মনে পড়ে না, তাহার পর বেঠিক সময়ে বেঠিক বাঃ লইয়া অস্থির হইয়া মরে। তোমার মত-লোক সুরবালার স্বামী হইয়া বুড়াবয়স পর্য্যন্ত বেশ সুখে থাকিতে পারিত, তুমি কিনা হইতে গেলে গারিবাল্‌ডি, এবং হইলে শেষে একটি পাড়াগেঁয়ে ইস্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার! আর রামলোচন রায় উকিল, তাহার বিশেষ করিয়া সুরবালারই স্বামী হইবার কোন জরু আবশ্যক ছিল না, বিবাহের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে সুরবালাও যেমন ভবশঙ্করীও তেমন, সেই কিনা কিছুমাত্র না ভাবিয়া চিন্তিয়া বিবাহ করিয়া সরকারী উকীল হইয়া দিব্য টাকা রোজগার করিতেছে—যেদিন দুধে ধোঁয়ার গন্ধ হয় সে দিন সুরবালাকে তিরস্কার করে, যে দিন মন প্রসন্ন থাকে সেদিন সুরবালার জন্য গহনা গড়াইতে দেয়। বেশ মোটাসোটা, চাপকান-পরা, কোন অসন্তোষ নাই, পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া আকাশের তারার দিকে চাহিয়া কোন দিন হাহুতাশ করিয়া সন্ধ্যাযাপন করেনা।

রামলোচন একটা বড় মকদ্দমায় কিছুকালের জন্য অন্যত্র গিয়াছে। আমার স্কুলঘরে আমি যেমন একা ছিলাম সেদিন সুরবালার ঘরেও সুরবালা বোধ করি সেইরূপ একা ছিল।

মনে আছে সেদিন সোমবার। সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে। বেলা দশটা হইতে টিপ্‌টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। আকাশের ভাবগতিক দেখিয়া হেড

মাষ্টার সকাল সকাল স্কুলের ছুটি দিলেন। খণ্ড খণ্ড কালো ে
যেন একটা কি মহা আয়োজনে সমস্ত দিন আকাশময় আনাগো
করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরদিন বিকালের দি
মুষলধারে বৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আরম্ভ হইল। যত রা
হইতে লাগিল বৃষ্টি এবং ঝড়ের বেগ বাড়িতে চলিল। প্রথ
পূর্ব্বদিক হইতে বাতাস বহিতেছিল ক্রমে উত্তর এবং উত্তরপ
দিয়া বহিতে লাগিল। এ রাত্রে ঘুমাইবার চেষ্টা করা বৃ
মনে পড়িল এই দুর্য্যোগে সুরবালা ঘরে একলা আছে। আ-
দের স্কুলঘর তাহাদের ঘরের অপেক্ষা অনেক মজবুত। কতব
মনে করিলাম, তাহাকে স্কুলঘরে ডাকিয়া আনিয়া আমি পু-
রিণীর পাড়ের উপর রাত্রিযাপন করিব। কিন্তু কিছুতেই ম
স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

রাত্রি যখন একটা দেড়টা হইবে হঠাৎ বানের ডাক শো
গেল—সমুদ্র ছুটিয়া আসিতেছে। ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া বা
হইলাম। সুরবালার বাড়ির দিকে চলিলাম। পথে আমাদে
পুষ্করিণীর পাড়—সে পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতে আমার হাঁটু জ
হইল। পাড়ের উপরে যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন দ্বিতী
আর একটা তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের পুকুরে
পাড়ের একটা অংশ প্রায় দশ এগারো হাত উচ্চ হইবে।

পাড়ের উপরে আমিও যখন উঠিলাম, বিপরীত দিক হইতে
আর একটি লোকও উঠিল। লোকটি কে তাহা আমার সমস্ত
অন্তরাত্মা, আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিল। এবং
সেও যে আমাকে জানিতে পারিল তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

আর সমস্ত জলমগ্ন হইয়া গেছে কেবল হাত পাঁচ ছয় দ্বীপের
উপর আমরা দুটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন প্রলয়

কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিল না, এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিভিয়া গেছে—তখন একটা কথা বলিলেও ক্ষতি ছিল না—কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। কেহ কাহাকেও একটা কুশল প্রশ্নও করিল না।

কেবল দুজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল। আজ সমস্ত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া সুরবালা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই। কবেকার সেই শৈশবে সুরবালা কোন্ এক জন্মান্তর কোন্ এক পুরাতন রহস্যান্ধকার হইতে ভাসিয়া এই সূর্য্য-চন্দ্রালোকিত লোকপরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে আমারই পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছিল; আর আজ কতদিন পরে সেই আলোকময় লোকময় পৃথিবী ছাড়িয়া এই ভয়ঙ্কর জনশূন্য প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে সুরবালা একাকিনী আমারই পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। জন্মস্রোতে সেই নবকলিকাকে আমার কাছে আনিয়া ফেলিয়াছিল, মৃত্যুস্রোতে সেই বিকশিত পুষ্পটিকে আমারই কাছে আনিয়া ফেলিয়াছে এখন কেবল আর একটা ঢেউ আসিলেই পৃথিবীর এই প্রান্তটুকু হইতে বিচ্ছেদের এই বৃন্তটুকু হইতে খসিয়া আমরা দুজনে এক হইয়া যাই।

সে ঢেউ না আসুক! স্বামীপুত্রগৃহধনজন লইয়া সুরবালা চিরদিন সুখে থাকুক্! আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল—ঝড় থামিয়া গেল, জল নামিয়া গেল—সুরবালা কোন কথা না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গেল, আমিও কোন কথা না বলিয়া আমার ঘরে গেলাম।

ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্তাদারও হই নাই, গারিবাল্ডিও হই নাই, আমি এক ভাঙ্গা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্ত-রাত্রির উদয় হইয়াছিল—আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি মাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।

পাখী-ছাড়া।

(খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছ? খোকার মা এই পথে আসিলে খোকাকে ছাড়িয়া দিও। অবশ্য খোকাবাবু ঝাঁপাইয়া জননীর উৎসঙ্গে আরোহণ করিবেন। "আঃ একদণ্ড ও সোয়াস্তি নাই" ইত্যাদি বাক্যে যখন সুন্দরী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইবে তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এই কবিতাটি পাঠ করিও।)

১

তুমি কি গো হর, সখি, আমি কি অনঙ্গ?
সুন্দরি, শ্রী-অঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ?
পিঞ্জর খুলিয়া দিনু,
শিকলি কাটিয়া দিনু,
বনেতে উড়িয়া গেল বনের বিহঙ্গ—
সুন্দরি, শ্রী-অঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ?
পুষ্পিত-হরিত-পাতা
কোমল শ্যামল লতা
পুনঃ পেয়ে, বন-পাখী করে কত রঙ্গ!

ললিত হরিত শাখে
গগন-বিহারী ডাকে,
ভুলি পিঞ্জরের খেদ, ভুলিয়া আতঙ্ক!
কেন মিছে হও বাদী ?
আমি নহি অপরাধী—
পল্লব-বসনা শাখী আছিল উলঙ্গ,
পাখীর পরশে তার সার্থক উৎসঙ্গ !
আন্দোলিয়া শ্যামকায়,
চঞ্চল সমীর ধায়,—
রবিচ্ছায়া দেহে পড়ে; ফুলাইয়া অঙ্গ
হের, দেখ, সোহাগিনি, বিহগের রঙ্গ !
পিঞ্জর খুলিয়া দিনু
শিকলি কাটিয়া দিনু,
বনেতে উড়িয়া গেল বনের বিহঙ্গ—
সুন্দরি, শ্রীঅঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ ?
মিঠি মিঠি তব দিঠি,
গেল সখি কোথা সিটি,
যে আরসী হেরি হোত উদাসী কুরঙ্গ ?
কর, কর রোষহীন নয়ন-অপাঙ্গ।
চারিধারে মুক্তাকাশ,
মলয়া বহিছে বাস,
চারিধারে উছলিছে সৌরভ তরঙ্গ !
আধা মোদা, আধা খোলা
নয়নে চাহিছে ভোলা;
ক্লান্তি, শ্রান্তি বিসরিছে; জুড়াইছে অঙ্গ।

সুন্দরি, শ্রীঅঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ ?
দেখ, দেখ, স্নেহময়ি,
নীড়েতে পশিল ওই
বনচর ; হোথা নাই ভাবনা-ভুজঙ্গ।
হাসিয়ে পাতে না ফাঁশ,
কিরাত, নয়ন-ত্রাস ;
নিরিবিলি বনস্থলী, বিহীন-আতঙ্ক !
দেবভোগ্য ক্ষীর-ফল,
সুধা ঢালে অবিরল ;
উধাও অরণ্য পানে সাধে কি বিহঙ্গ ?
সুন্দরি, শ্রীঅঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ ?
বনের বিহগ ওরা,
নগরের প্রাণচোরা
বায়ু নাহি ভালবাসে ; মুক্ত-বায়ু-সঙ্গ
পেয়ে যেন মাতোয়ারা বনের বিহঙ্গ !
কি জানি কেমন পাখী
সোনার পিঞ্জরে রাখি,
সুন্দর সামগ্রী দিনু ; হ্যাদে দেখ রঙ্গ !
কিছুতেই বাজিল না প্রাণের সারঙ্গ
(তাই) পিঞ্জর খুলিয়া দিনু,
শিকলি কাটিয়া দিনু,
বনেতে উড়িয়া গেল বনের বিহঙ্গ—
সুন্দরি, শ্রী অঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ ?

প্যারিস্ হইতে লণ্ডনে।

য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী।

৮ সেপ্টেম্বর। পথের মধ্যে আমাদের প্যারিসে নাব্‌বার প্রস্তাব হচ্চে। কিন্তু আমাদের এই ট্রেন্ প্যারিসে যায় না— একটু পাশ কাটিয়ে যায়। প্যারিসের একটি নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে স্পেশল ট্রেন্ প্রস্তুত রাখবার জন্যে টেলিগ্রাফ্ করা গেল।

রাত দু'টোর সময় আমাদের জাগিয়ে দিলে। ট্রেন বদল রতে হবে। জিনিষপত্র বেঁধে বেরিয়ে পড়লুম। বিষম গু। অনতিদূরে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে। কেবলমাত্র কটি এঞ্জিন্, একটি ফার্ষ্টক্লাস্ গাড়ি, এবং একটি ব্রেক্‌ভ্যান্। ারোহীর মধ্যে আমরা তিনটি ভারতবর্ষীয়। রাত তিনটের য়ে প্যারিসের জনশূন্য বৃহৎ ষ্টেশনে পৌঁছন গেল। সুপ্তোত্থিত ই একজন "ম্যসিয়" আলো হস্তে উপস্থিত। অনেক হাঙ্গাম রে' নিদ্রিত কাষ্টম্ হৌস্‌কে জাগিয়ে তার পরীক্ষা থেকে ত্তীর্ণ হয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করলুম। তখন প্যারিস্ তার মস্ত দ্বার রুদ্ধ করে' স্তব্ধ রাজপথে দীপশ্রেণী জ্বালিয়ে থে নিদ্রামগ্ন। আমরা হোটেল ট্যার্মিনুতে আমাদের শয়ন- ক্ষে প্রবেশ করলুম। পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, বিদ্যুদুজ্জ্বল, স্ফটিক- ণ্ডিত, কার্পেটাবৃত, চিত্রিতভিত্তি, নীলযবনিকাপ্রচ্ছন্ন শয়ন- ালা; বিহগপক্ষ সুকোমল শুভ্র শয্যা।

বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শয়নের উদ্যোগ করবার সময় দেখা গল আমাদের জিনিষপত্রের মধ্যে আর এক জনের ওভার্‌কোট্ াত্রবস্ত্র। আমরা তিনজনেই পরস্পরের জিনিষ চিনিনে; সুতরাং াতের কাছে যে কোন অপরিচিত বস্তু পাওয়া যায় সেইটেই

আমাদের কারো-না-কারো স্থির করে' অসংশয়ে সংগ্রহ করে' আনি। অবশেষে নিজের নিজের জিনিষ পৃথক্ করে' নেবার পর যখন দুটো চারটে উদ্বৃত্ত সামগ্রী পাওয়া যায়, তখন তা' আর পূর্ব্বাধিকারীকে ফিরিয়ে দেবার কোন সুযোগ থাকে না। ওভারকোট্‌টি রেলগাড়ি থেকে আনা হয়েচে; যার কোট্ সে বেচারা বিশ্বস্তচিত্তে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। গাড়ি এতক্ষণে সমুদ্র-তীরস্থ ক্যালে নগরীর নিকটবর্ত্তী হয়েচে। লোকটি কে, এবং সমস্ত বৃটিশ রাজ্যের মধ্যে তার ঠিকানা কোথায়, আমরা কিছুই জানিনে। মাঝের থেকে তার লম্বা কুর্ত্তি এবং আমাদের পাপে ভার স্কন্ধের উপর বহন করে বেড়াচ্চি—প্রায়শ্চিত্তের পথ ব মনে হচ্চে, একবার যে লোকটির কম্বল হরণ করেছিলুম কুর্ত্তিটিও তার। কারণ, রেলগাড়িতে সে ঠিক আমাদের পরব শয্যা অধিকার করেছিল। সে বেচারা বৃদ্ধ, শীতপীড়ি বাতে পঙ্গু, অ্যাংলো-ইণ্ডিয় পুলিস্ অধ্যক্ষ। পুলিসের ক করে' মানবচরিত্রের প্রতি সহজেই তার বিশ্বাস শিথিল হ এসেছে, তার পরে যখন দেখ্‌বে এক যাত্রায় একই রকম ঘট একই লোকের দ্বারা গভীর রাত্রে দুই দুইবার সংঘটন হ তখন আর যাই হোক্ কখনই আমাকে সে ব্যক্তি সুশীল ব ঠাওরাবে না। বিশেষতঃ কাল প্রত্যূষে ব্রিটিশ্ চ্যানেল্ প হবার সময় তীব্র শীতবায়ু যখন তার হৃতকুর্ত্তি জীর্ণ দেহ কম্পান্বিত করে' তুল্‌বে তখন সেই সঙ্গে মনুষ্যজাতির সাধুত প্রতিও তার বিশ্বাস চতুর্গুণ কম্পিত হতে থাক্‌বে।

৯ সেপ্টেম্বর। প্রাতঃকালে দ্বিতীয়বার বেশ পরিবর্ত্তন ক বার সময় দেখা গেল আমার বন্ধুর একটি পোর্টম্যান্টো পাও যাচ্চে না। আমরা যে তিনটি লোক পৃথিবী পর্য্যটনে বেরিয়ে

তিনজনেই প্রায় সমান। আমার বোধ হচ্চে, মাসতিনেক পরে যখন জন্মভূমিতে ফির্‌ব তখন দেখ্‌তে পাব আমাদের নিজের আবশ্যকীয় যে ক'টি জিনিষ সঙ্গে এনেছিলুম তার একটিও নেই এবং পরের অনাবশ্যক স্তূপাকার জিনিষ কোথায় রাখ্‌ব স্থান পাচ্চিনে, মাশুল দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে বেড়াচ্চি এবং মাঝে মাঝে অসহ্য ব্যাকুল হয়ে ভিন্ন ভাষার সংবাদপত্রে বহু-ব্যয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্চি।

যাহোক্ পুলিসে সংবাদ দিয়ে প্রাতঃকালে আমরা তিন জনে প্যারিসের পথে পদব্রজে বেরিয়ে পড়লুম। প্রকাণ্ড রাজপথ দোকান বাগান প্রাসাদ প্রস্তরমূর্ত্তি ফোয়ারা লোকজন গাড়ি-ঘোড়ার মধ্যে অনেক ঘুরে ঘুরে এক ভোজন-গৃহের বিরাট স্ফটিকশালার প্রান্তটেবিলে বসে' অল্প আহার করে' এবং বিস্তর মূল্য দিয়ে ঈফেল্ স্তম্ভ দেখ্‌তে গেলেম। এই লৌহস্তম্ভ চারি পায়ের উপরে ভর দিয়ে এক কাননের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কলের দোলায় চড়ে' এই স্তম্ভের চতুর্থ তলায় উঠে নিয়ে সমস্ত প্যারিসটাকে খুব একটা বড় ম্যাপের মত প্রসারিত দেখ্‌তে পেলুম।

বলা বাহুল্য, এমন করে' একদিনে তাড়াতাড়ি চক্ষু দ্বারা বহির্ভাগ লেহন করে' প্যারিসের রসাস্বাদন করা যায় না। এ যেন, [illegible]গৃহের মেয়েদের মত বদ্ধ পাল্কীর মধ্যে থেকে গঙ্গাস্নান করার [illegible]ত—কেবল নিতান্ত তীরের কাছে একটা অংশে এক ডুবে যত-খানি পাওয়া যায়। কেবল হাঁপানিই সার।

হোটেলে এসে দেখ্‌লুম পুলিসের সাহায্যে বন্ধুর পোর্টম্যাণ্টো ফিরে এসেছে, কিন্তু এখনো সেই পরের হৃতকোর্ত্তা সম্বন্ধে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে আছি।

১০ সেপ্টেম্বর। লণ্ডন অভিমুখে চল্লুম। সন্ধ্যার সময় লণ্ডনে

পৌঁছে দুই একটি হোটেল অন্বেষণ করে' দেখা গেল স্থানাভাব। অবশেষে একটি ভদ্র পরিবারের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল।

১১ সেপ্টেম্বর। সকালবেলায় আমাদের পুরাতন বন্ধুদের সন্ধানে বাহির হওয়া গেল।

প্রথমে, লণ্ডনের মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত বাড়ির দ্বারে গিয়ে আঘাত করা গেল। যে দাসী এসে দরজা খুলে দিলে তাকে চিনিনে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম আমার বন্ধু বাড়িতে আছেন কি না। সে বল্লে তিনি এ বাড়িতে থাকেন না। জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় থাকেন? সে বল্লে, আমি জানিনে, আপনারা ঘরে এসে বসুন আমি জিজ্ঞাসা করে আসচি। পূর্ব্বে যে ঘরে আমরা আহার করতুম সেই ঘরে গিয়ে দেখ্‌লুম সমস্ত বদল হয়ে গেছে—সেখানে টেবিলের উপর খবরের কাগজ এবং বই—সে ঘর এখন অতিথিদের প্রতীক্ষাশালা হয়েছে। খানিকক্ষণবাদে দাসী একটি কার্ডে লেখা ঠিকানা এনে দিলে। আমার বন্ধু এখন লণ্ডনের বাইরে কোন্ এক অপরিচিত স্থানে থাকেন। ভারি নিরাশ হৃদয়ে আমার সেই পরিচিত বাড়ি থেকে বেরলুম।

মনে কল্পনা উদয় হল, মৃত্যুর বহুকাল পরে আমার যেন পৃথিবীতে ফিরে এসেচি। আমাদের সেই বাড়ির দরজার কাছে এসে দ্বারীকে জিজ্ঞাসা করলুম—আমার সেই অ... এখানে আছে ত? দ্বারী উত্তর করলে—না—সে অনেক দিন হল চলে গেছে।—চলে গেছে? সেও চলে গেছে! আমি মনে করেছিলুম কেবল আমিই চলে গিয়েছিলুম, পৃথিবী-সুদ্ধ আর সবাই আছে। আমি চলে যাওয়ার পরেও সকলেই আপন আপন সময় অনুসারে চলে গেছে। তবে ত সেই সমস্ত জানা

লোকেরা আর কেহ কারো ঠিকানা খুঁজে পাবে না! জগতের কোথাও তাদের আর নির্দ্দিষ্ট মিলনের জায়গা রইল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌চি এমন সময়ে বাড়ির কর্ত্তা বেরিয়ে এলেন—জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে হে! আমি নমস্কার করে' বল্লুম, আজ্ঞে, আমি কেউ না, আমি বিদেশী।—কেমন করে' প্রমাণ করব এ বাড়ি আমার এবং আমাদের ছিল! একবার ইচ্ছে হল, অন্তঃপুরের সেই বাগানটা দেখে আসি; আমার সেই গাছগুলো কত বড় হয়েছে! আর সেই ছাতের উপরকার দক্ষিণ-মুখো কুঠরি, আর সেই ঘর এবং সেই ঘর এবং সেই আর একটা ঘর। আর সেই যে ঘরের সম্মুখে বারান্দার উপর ভাঙ্গা টবে গোটাকতক জীর্ণ গাছ ছিল—সেগুলো এত অকিঞ্চিৎকর যে সেগুলো হয়ত ঠিক তেম্‌নি রয়ে গেছে তাদের সরিয়ে ফেল্‌তে কারো মনেও পড়েনি!

আর বেশিক্ষণ কল্পনা করবার সময় পেলুম না। আমাদের গাড়ি মিস্ শ-য়ের বাড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়াল। গিয়ে দেখ্‌লুম তিনি নির্জ্জনগৃহে বসে' একটি পীড়িত কুক্কুরশাবকের সেবায় নিযুক্ত আছেন। জল বায়ু, পরস্পরের স্বাস্থ্য এবং কালের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত শিষ্টালাপ করা গেল।

সেখান থেকে বেরিয়ে, লণ্ডনের সুড়ঙ্গপথে যে পাতাল-বাষ্পযান চলে, তাই অবলম্বন করে' বাসায় ফেরবার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু পরিণামে দেখ্‌তে পেলুম পৃথিবীতে সকল চেষ্টা সফল হয় না। আমরা দুই ভাই ত গাড়িতে চড়ে' বেশ নিশ্চিন্ত বসে' আছি; এমন সময় গাড়ি যখন হ্যামার্‌স্মিথ্ নামক দূরবর্ত্তী ষ্টেশনে গিয়ে থাম্‌ল তখন আমাদের বিশ্বস্ত চিত্তে ঈষৎ সংশয়ের সঞ্চার হল। একজনকে জিজ্ঞাসা করাতে সে স্পষ্ট বুঝিয়ে

দিলে আমাদের গম্যস্থান যে দিকে এ গাড়ির গম্যস্থান সেদিকে নয়। পুনর্ব্বার তিন চার ষ্টেশন ফিরে গিয়ে গাড়ি বদল করা আবশ্যক। তাই করা গেল। অবশেষে গম্য ষ্টেশনে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে আমাদের বাসা খুঁজে পাইনে। বিস্তর গবেষণার পর বেলা সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা টিফিন খাওয়া গেল। এইটুকু আত্মজ্ঞান জন্মেছে যে, আমরা দুটি ভাই লিভিংষ্টোন অথবা ষ্ট্যান্‌লির মত ভৌগোলিক আবিষ্কারক নই; পৃথিবীতে যদি অক্ষয় খ্যাতি উপার্জ্জন করতে চাই ত নিশ্চয়ই অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

(চৈতন্য লাইব্রেরির ষড়বিংশ অধিবেশনে প্রপঠিত।)

মহরমের সময় সিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা যেমন রাস্তার মাঝখানে হাসেন্ হোসেন্ করিয়া বক্ষে করাঘাত করে, ঠিক্ সেইরূপ একটা ক্রন্দন এবং বিলাপের অভিনয় সম্প্রতি আমাদের দেশের একদল নিষ্কর্ম্মা লোকের একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঁদুনি-গায়কদিগের ধুয়া এই যে, আমাদের দেশের এখন যে একটি সেকেলে পৈতৃক সম্পত্তি—বৈরাগ্য, একেলে সভ্যতার হস্তে পড়িয়া তাহার অন্তিমদশা ঘুনাইয়া আসিয়াছে—তিনি আর বেশী দিন টেকেন না! এইরূপ ক্রন্দন শুনিলে আমাদের হাসিও পায়, কান্নাও পায়। হাসি পায় তার কারণ এই যে, বৈরাগ্য যদি এতই তোমার প্রিয় বস্তু, তবে তাহার পথ অবলম্বন কর——ক্রন্দন কেন? একেলে সভ্যতা তো আর তোমার হাত পা বাঁধিয়া রাখে নাই; কোতোয়ালের প্রতি মহারাণীর এমন তো

কোনো শক্ত রাজাজ্ঞা নাই যে, "কাহাকেও বৈরাগ্যের পথে চলিতে দেখিয়াছ কি আর অমনি তাহার শির লইবে!" বৈরাগ্য তো আর বাজারের সামগ্রী নয় যে, সেকালের বাজারে তাহা সুলভ ছিল, একালের বাজারে তাহা দুর্মূল্য হইয়াছে! বাজারের সামগ্রী স্বতন্ত্র, আর, অন্তঃকরণের সামগ্রী স্বতন্ত্র; বাজারের সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু—অন্তঃকরণের সামগ্রী সাধনের বস্তু। তুমি বলিবে যে, কাল পড়িয়াছে শক্ত; চব্বিস ঘণ্টা সংসার-কার্য্যে চব্বিস আনা লিপ্ত থাকিলে, যদি এক আনা কাজ হাসিল হয় তবে তাহাই গৃহী ব্যক্তির পরম সৌভাগ্য; দেখিতেছ না—একটা কেরাণিগিরি খালি হইয়াছে কি আর অমনি দলকে-দল বি-এ এম্-এ কাতারে কাতারে পিঁপড়ার পালের ন্যায় আপিস অঞ্চলে গতায়াত করিতে থাকে! ইহার উত্তরে আমি এই বলি যে, প্রকৃত বৈরাগ্য সংসারের কোনো কর্ত্তব্য সাধনেরই প্রতিবন্ধকতাচরণ করে না—তাহা দূরে থাকুক্, সেরূপ বৈরাগ্য কর্ত্তব্য সাধনের পথ আরো পরিষ্কার করিয়া দেয়। বৈরাগ্য-অভ্যাস আর কিছু না—মনের সুর বাঁধা; সেতারের সুর বাঁধা থাকিলে তাহাতে, যে রাগিণী ইচ্ছা, সেই রাগিণীই বাজানো যাইতে পারে; তেমনি অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের সুর বাঁধা থাকিলে—যখন যাহা কর্ত্তব্য তাহাই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। মন রাগ-দ্বেষে অধীর থাকিলে হাতের কাজ কখনই ভাল হইতে পারে না; বৈরাগ্যের অভ্যুদয়ে মন প্রশান্ত হইলে কর্ত্তব্য কার্য্যে হাত পা আপনা হইতেই অগ্রসর হয়। আমরা পরে দেখাইব যে, প্রকৃত বৈরাগ্য নিষ্কাম কর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক; আর, যে বৈরাগ্য কর্ত্তব্য-সাধনের প্রতিবন্ধকতাচরণ করে, সে বৈরাগ্য বৈরাগ্যই নহে—তাহা বৈরাগ্যের ভান মাত্র। তবে যদি তোমার ক্রন্দনের

কারণ এই হয়—যে, সেকালে যেমন পথে ঘাটে হাটে বৈরাগ্যের ছড়াছড়ি ছিল, একালে তাহার চিহ্নপর্য্যন্তও লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে—যদি বল যে, ব্রাহ্মণের মাথায় টিকি নাই, জিহ্বাগ্রে সন্ধ্যার বুলি মুখস্থ নাই—বৈষ্ণবের নাশায় তিলক নাই, গলায় মালা নাই—শাক্তের ললাটে রক্তচন্দনের ফোঁটা নাই—এ অপেক্ষা বৈরাগ্যের অভাব আর কি হইতে পারে? তবে সেটা একটা কাঁদিবার কথা বটে! বলিতে কি—সেকাল-ভক্তের এইরূপ হৃদয়ভেদী ক্রন্দন শুনিলে আমাদেরও কান্না পায়; আমরা কাঁদি আর এক কারণে! সে কারণ এই যে, ইউরোপের তামসিক মধ্যম অব্দে তৎপ্রদেশে friar, monk, hermit প্রভৃতি কত সম্প্রদায়ের কত যে সন্ন্যাসী তপস্বী এবং বৈরাগী কত যে অদ্ভুত লীলা প্রদর্শন করিয়া রাজ্যের লোকদিগকে চমকিত করিতেন, তাহার আর 'বলতব্য কহতব্য' নাই; ইংলণ্ডীয় স্যাক্সন আমলের ডন্‌ষ্টন্ মুনি আমাদের দেশের পৌরাণিক আমলের দুর্ব্বাসা মুনি অপেক্ষা পরাক্রমে বেশী বই কম ছিলেন না! ইংরাজেরা মনে করিলে সেই সকল অদ্ভুত যোগী তপস্বীদিগের অদ্ভুত পরাক্রম স্মরণ করিয়া "হায় সেকাল হায় সেকাল" বলিয়া অশ্রুজলে টেম্‌স্ নদীকে পদ্মানদী করিয়া তুলিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন না—তাঁহাদের দেশের সেই সকল পুরাতন কীর্ত্তিস্মরণ করিয়া তাঁহাদের চক্ষে এক ফোঁটা জলেরও সঞ্চার হয় না, অধরে ঈষৎ হাস্যেরই উদ্রেক হয়! ইউরোপের চক্ষু জল-প্রিয় নহে—তাহা আলোকপ্রিয়! ইউরোপ অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া বার দুই হাই তুলিয়া বেগে গা-ঝাড়া দিতেই সেকালের সেইসব উৎপেতে জঞ্জাল-গুলা কোথায় যে কোনদিকে সট্‌কিয়া পড়িল—আর তাহার চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাওয়া গেল না। কিন্তু হায়! আমাদের এই

হতভাগ্য দেশের নিদ্রা ভাঙিয়াও ভাঙিতেছে না! আমাদের দেশের চক্ষে বিজ্ঞানের আলোক পতিত হইয়া একবার যেই তাহাকে সচকিত করিয়া তুলিতেছে—পরক্ষণেই আমাদের দেশ যেমন-কে-তেমনি শয্যায় অচেতন। কথাটি আর কিছু না—যেখানেই অন্ধ-ভক্তি অতিমাত্র প্রবল এবং জ্ঞানালোক অতিমাত্র ক্ষীণ, সেই-খানেই পেঁচা বাদুড় সাপ ব্যাঙ প্রভৃতি তামসিক জন্তুদিগের পরা-ক্রম দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে থাকে। সার ওয়াল্টর স্কটের আইভান্‌হো উপন্যাসের Friar Tuck একজন পেচক শ্রেণীর বৈরাগী ছিলেন—দিবালোকে তিনি কোটরের বাহিরে পদার্পণ করিতেন না। আমাদের দেশে পানিহাটি গ্রামে আজিও গঙ্গা-তীরে বটচ্ছায়া-পরিবৃত অতীব একটি রমণীয় কোটর দেখিতে পাওয়া যায়—পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে তাহা কাঙ্গালদাস বাবাজির আকড়া বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ; গ্রাম-বৃদ্ধদিগের মুখে কাঙ্গালদাস বাবাজির কীর্ত্তি-কাহিনী যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি যে, পেচক শ্রেণীর বৈরাগীদিগের একজন প্রধান নায়ক ছিলেন, সে বিষয়ে আর কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই গেল পেচক তপস্বী; বাদুড় তপস্বী কি? না মাথা নিচু পা উঁচু করিয়া গাছে-ঝোলা যোগী তপস্বী। সাপ-ব্যাঙ তপস্বী [illegible] না মাটির নীচে কবর দেওয়া সিদ্ধপুরুষ। এখনকার [illegible]র এই সকল অদ্ভুত যোগী তপস্বীদিগের অনটন দেখিয়া [illegible]গুলের কথকেরা কত না ললাটে করাঘাত করেন, কত [illegible]হুতাশ করিয়া ক্রন্দন করেন! ইহাঁদের এই ক্রন্দন [illegible]হলের মাঝখানে কে যেন আমাদের কর্ণকুহরে ধীরে [illegible] বলিতেছে যে, যেখানে দেখিবে—চিড়িয়াখানার যোগী [illegible]দিগের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া বিজ্ঞান শিল্প এবং বাণিজ্য

ব্যবসায়ের প্রতি লোকের ধিক্কার জন্মিতেছে সেইখানেই জানিবে জ্ঞানের দিবাকর অস্তমিত এবং অবিদ্যার ঘোরা তামসী বিভাবরী সমাগত।

পেঁচা বাদুড়, সাপ ব্যাঙ প্রভৃতি জন্তু-তপস্বীদিগকে আড়ালে সরাইয়া রাখিয়া প্রকৃত মানুষ-তপস্বী কিরূপ তাহার প্রতি একবার চক্ষুরুন্মীলন কর;—আফ্রিকা দেশের অন্তর্বিভাগের আবিষ্কর্ত্তাদিগের যাহার কাহারো অদ্ভুত কীর্ত্তি-কাহিনী পাঠ কর—দেখিতে পাইবে যে, মনুষ্য ভোগ-স্পৃহাকে কতদূর পশ্চাতে রাখিয়া, সম্মুখের বিভীষিকাকে কতদূর তুচ্ছ করিয়া, সংকল্প সাধনের পথে কতদূর অগ্রসর হইতে পারে। ইহাঁদের এক একজনের এক এক কার্য্য দেখিলে মনে হয় যে, মনুষ্যের অ[illegible]াধ্য কার্য্যই নাই, মনুষ্যের অগম্য স্থানই নাই। ইহাঁদের তপঃসাধ[illegible]নের প্রণালীই স্বতন্ত্র! সম্মুখে বিপদ্ বলিয়া বিপদ নহে—বিপদের পর্ব্বত-পরম্পরা উপর্য্যুপরি মাথা তুলিয়া পথ আগলিয়া দাঁড়াইয়া আছে; সমস্ত প্রদেশই অজ্ঞাত অপরিচিত; সকলই প্রহেলিকা—সকলই গোলোক-ধাঁদা; উপস্থিত মতে বুদ্ধি খাটাইয়া এক এক পদ অগ্রসর হওয়া হইতেছে, আর, চারিদিকের কোথায় কি আছে না আছে তাহার সন্ধান লওয়া হইতেছে; সঙ্গে লোক একে তো পঞ্চাশের অধিক নহে, তাহাতে আবার তাহারা সক[illegible] কাফ্রী; ব্যথার ব্যথী কেবল একজন মাত্র স্বদেশীয় ভ্রাতা—[illegible] পীড়ায় মরণাপন্ন; তাঁহার সেবার ত্রুটি না হয় এটা খুব [illegible] তার সহিত ঘড়ি ঘড়ি দেখিতে হইতেছে; মরুভূমির মধ্যে তিন দিন জলাভাবে এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশের তিন চারিদিন অন্নাভাবে প্রাণ ওষ্ঠাগত; মাথার উপরে [illegible] দিবাকর এবং বায়ু যেন কালের নিশ্বাসাগ্নি! তাহাতে আ[illegible]

ঘটনাক্রমে বোল্‌তার চাকে ঘা দেওয়া হইয়াছে—একজন দেশীয় রাজাকে নজর দিয়া তুষ্ট করা হয় নাই; সেই গুরুতর অপরাধের শাস্তি দিবার জন্য চারিদিকে সহস্রাধিক শত্রু ঘাটি মারিয়া শিকার প্রতীক্ষা করিতেছে। এই সকল ভয়ঙ্কর বিঘ্ন বিপত্তির মধ্য-স্থলে আবিষ্কর্ত্তা এক দিনের জন্যও ভগ্নোদ্যম হ'ন নাই; ক্ষণকালের জন্যও তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়েন নাই—বিছানায় শুইয়া পড়েন নাই; ক্রমাগতই তিনি সাহসে ভর করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। যখন যাহা আবশ্যক তাহারই জন্য তিনি প্রস্তুত! সুবিশাল মরুভূমি পার হইতে হইবে তাহারই জন্য প্রস্তুত! দুস্তর নদীতে নৌ-সেতু বাঁধিয়া ওপারে যাইবার পথ খুলিতে হইবে, তাহারই জন্য প্রস্তুত! প্রাণ হস্তে করিয়া শত্রুদলের মধ্য দিয়া যাত্রা করিতে হইবে, তাহারই জন্য প্রস্তুত! ইহা কি তপস্যা নহে! পৃথিবীর মেরুপ্রান্তের আবিশ্চিকীর্ষু মহাত্মারা আরো ভয়ঙ্কর অধ্যবসায়ী। এক দিন নয়—দুই দিন নয়—ছয় ছয় মাস ধরিয়া, কখনো বা বৎসরেক ধরিয়া, প্রতিমুহূর্ত্ত তাঁহারা শব-সাধনের বিভীষিকায় পরিবেষ্টিত! এক এক মুহূর্ত্ত এক এক বৎসর! কখন্ কোথা হইতে এবং কতদিক্ হইতে বরফের চাপ আসিয়া তাঁহাদিগকে পিশিয়া ফেলিবে, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই; কিয়ৎপরেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাপ চৌদিক্ ঘিরিয়া জাহাজকে আটক করিয়া ফেলিয়াছে—আর জাহাজ-শুদ্ধ সমস্ত লোক কুঠার হস্তে করিয়া কেবলি বরফ কাটিতেছে—কেবলি বরফ কাটিতেছে! বরফ কাটিয়া বরফ কাটিয়া সম্মুখের পথ পরিষ্কার করিতেছে; পশ্চাতের পথ নহে—সম্মুখের পথ! এইরূপে দিন যাইতেছে রাত্রি যাইতেছে, শুক্ল-

পক্ষ যাইতেছে কৃষ্ণপক্ষ যাইতেছে—চক্ষে নিদ্রা নাই—হস্তপদে বিরাম নাই; শীত এমনি যে, তাহার প্রবল পরাক্রমে কাহারো কাহারো অঙ্গুলি খসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে! এ কি তপস্যা নহে! তপস্যা শুধু কি মাথা নিচু পা উঁচু করিয়া গাছে ঝোলা আর পাতা ভক্ষণ করা! আফ্রিকার অন্তর্ভাগের জর্ম্মান আবিষ্কর্ত্তা যাঁহার কথা আমি একটু পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি—তিনি তাঁহার দৈনিক পুস্তকে এক স্থানে এটাও লিখিয়াছেন যে, "এত শত বিঘ্ন বিপত্তির মাঝখানে আমি ভগ্নোদ্যম হইতেছি না কেবল এই ভরসায় যে, সিদ্ধিদাতা বিধাতা কর্ত্তৃক আমি এ কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছি—এ কার্য্যে আমার জয়-লাভ হইবেই হইবে।" সমস্ত পথে ঈশ্বরের হস্ত ইঁহার নেতা—ঈশ্বরের মুখ-জ্যোতি ইঁহার ধ্রুবতারা—ইনি কি তপস্বী নহেন!

এই সকল মানুষ-তপস্বীদিগের অনুরাগ রাখিবার স্থান সর্ব্বোপরি ঈশ্বর এবং তাহার নীচেই স্বদেশ। ইহাঁরা স্বদেশের মুখ চাহিয়া ভীষণ তরঙ্গ-সংকুল দুস্তর মহাসাগর ভেলায় পার হ'ন; দুরারোহ পর্ব্বত-শিখরে মনুষ্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন; দেশের নামের দিগ্বিজয়ী মন্ত্রে ইহাঁদের দুই বাহু সহস্র বাহু হইয়া উঠে; দেশের নামে ইহাঁদের আক্রমণ-বেগ বিদ্যুৎকে হাসিয়া উড়াইয়া দেয় এবং সেই নামের সিংহনাদে ইহাঁদের প্রচণ্ড প্রতাপ উদ্যত বজ্রকে ভস্ম করিয়া ফেলে!

প্রতীচ্য প্রদেশে ঈশ্বরানুরাগের এক ধাপ নীচেই স্বদেশানুরাগ পূজ্য; তার সাক্ষী—মহাকবি শেক্সপীয়র তাঁহার অষ্টম হেনরি নাম নাটকে কার্ডিনাল উল্‌সীকে দিয়া বলাইয়াছেন—"Be just and fear not. Let all the ends thou aimest

at be thy country's, thy God's and truth's; ন্যায় পথে থাক, ভয় করিও না; তোমার সংকল্পিত সকল কার্য্যেরই যেন চরম লক্ষ্য হয় তোমার স্বদেশ তোমার ঈশ্বর এবং সত্য। কার্ডিনাল উল্‌সী যদি আমাদের দেশে জন্ম-গ্রহণ করিতেন তবে খুব সম্ভব যে, ঐ জায়গাটিতে তাঁহার মুখে দেশ-শব্দের পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম-শব্দ বাহির হইত; তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন যে, তোমার সংকল্পিত সকল কার্য্যেরই যেন চরম লক্ষ্য হয়—তোমার ধর্ম্ম, তোমার ভগবান্ এবং সত্য। কিন্তু ধর্ম্ম-শব্দের অর্থ এখানে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম তত নয় যত জাতীয় ধর্ম্ম অথবা যাহা একই কথা কুলধর্ম্ম; যেমন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধবিগ্রহ, বৈশ্যের ধর্ম্ম কৃষি-বাণিজ্য। জাতি-ভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ, গৃহভেদ, এইরূপ ভেদ-বাহুল্য আমাদের দেশের এমনি একটা অস্থিমজ্জাগত রোগ যে, সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মও আমাদের দেশে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশেষ বিশেষ আকার ধারণ করিয়া বসিয়া আছে; তাহা এইরূপ যে, দেখিলে হঠাৎ মনে হয়, যেন তাহা বিশেষ কোনো একটি সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি। যেমন, শমদমাদি-সাধন মুমুক্ষু ব্রহ্মজ্ঞানীর ধর্ম্ম; যমনিয়মাদি সাধন যোগীর ধর্ম্ম; যেন এ দুই প্রকার সাধনাঙ্গের কোনোটিই সাধারণতঃ সকল ব্যক্তির ধর্ম্ম নহে! কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে—কি শমদমাদি সাধন, কি যম-নিয়মাদি সাধন, দুইই, বস্তু যা—তা এক বই দুই নহে;—কি? না সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম; অর্থাৎ সাধারণতঃ সকল মনুষ্যেরই অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। এরূপ যখন—তখন তাহা সর্ব্বসাধারণের সাধনের সামগ্রী হওয়া উচিত; তাহা না হইয়া, মনুষ্য মাত্রেরই অনুষ্ঠেয় সেই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম আমা-

দের দেশে যোগী তপস্বীদিগের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তা বই, জন-সাধারণের ধর্ম্ম শুদ্ধ কেবল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়াছে; যেমন, ব্রাহ্মণ জাতির ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়জাতির ক্ষাত্র ধর্ম্ম, বৈশ্যজাতির বাণিজ্য ধর্ম্ম, শূদ্রজাতির দাস্য ধর্ম্ম ইত্যাদি। আমাদের দেশে জাতি এবং ধর্ম্ম দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এত অল্প যে, জাতি রক্ষার নামই ধর্ম্মরক্ষা এবং ধর্ম্মরক্ষার নামই জাতি-রক্ষা। ইহার কারণ আর কিছু না—ইউরোপাদি প্রতীচ্য ভূমি-খণ্ডে মনুষ্যের প্রধান একটি গৌরব স্থল যেমন—স্বদেশ, আমাদের দেশে তেমনি—স্বজাতি। ইংরাজের মুখে "আমি ইংরাজ" এটা যেমন একটা জোরালো কথা, ক্ষত্রিয়ের মুখে "আমি ক্ষত্রিয়সন্তান" এটাও তেমনি একটা জোরালো কথা বটে—কিন্তু আর এক হিসাবে। "আমি ইংরাজ" এটা দেশীয় গৌরবের উচ্ছ্বাসবাণী; "আমি ক্ষত্রিয়-সন্তান" এটা জাতীয় গৌরবের অথবা বংশগৌরবের উচ্ছ্বাস-বাণী। ইউরোপীয়েরা যেমন দেশ রক্ষার্থে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, আমাদের দেশের লোকেরা তেমনি জাতি-রক্ষার্থে প্রাণ দিতে প্রস্তুত; তাহার সাক্ষী—এক শতাব্দী পূর্ব্বে আমেরিকার রাজ-বিদ্রোহ দেশ-রক্ষার সংকল্প হইতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল—সিকি শতাব্দী পূর্ব্বে সিপাহী বিদ্রোহ জাতি-রক্ষার সংকল্প হইতে, টোটা-কাটার বিভীষিকা হইতে, জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আজ বলিয়া নয়—মান্ধাতার আমল হইতে চিরকালই আমাদের দেশে দেশীয় মর্য্যাদা জাতীয় মর্য্যাদার নিকটে নতশির। আমাদের দেশে স্বজাতি বিজাতির মধ্যে যেমন কড়াক্কড় প্রভেদের সীমা নির্দ্ধারিত রহিয়াছে—স্বদেশ বিদেশের মধ্যে তাহার সিকির সিকিও নাই;—এখনও নাই, পূর্ব্বেও ছিল না। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা মনকে এই বলিয়া

প্রবোধ দিতেন যে, ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোনো দেশ দেশই নহে; তাহার সাক্ষী—কালিদাস হিমালয়ের বর্ণনাস্থলে বলিয়াছেন "পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যাইব মানদণ্ডঃ" হিমালয় পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া যেন পৃথিবী মাপিতেছে—অর্থাৎ এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত পৃথিবী জুড়িয়া অবস্থিতি করিতেছে। তাঁহারা যে, আর কোনো দেশের অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না—এরূপ কথা আমি বলিতেছি না; আমি কেবল বলিতেছি যে, তাঁহাদের মনের ভাব এইরূপ ছিল—যেন ভারতবর্ষই সমগ্র পৃথিবী—আর কোন দেশ দেশই নহে। আর আর দেশকে তাঁহারা যদি বিদেশ বলিয়াও গণ্য করিতেন তাহা হইলে সেই বিদেশের প্রতিযোগে ভারতবর্ষ তাঁহাদের স্বদেশ পদবীতে উত্থান করিত। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা আর আর দেশকে একেবারেই ন-স্যাৎ করিয়া উড়াইয়া দেওয়াতে ভারতবর্ষ তাঁহাদের নিকটে সমগ্র পৃথিবী হইয়া দাঁড়াইল—স্বদেশ আর হইতে পারিল না। এই কারণ গতিকে—ভারতবর্ষীয় সমস্ত খণ্ড জড়াইয়া একটি ব্যাপক স্বদেশীয় ভাব, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মনে জন্মিবারই অবকাশ পাইল না।

প্রতীচ্য ভূখণ্ডে স্বদেশের গাত্রে অপমানের একটু আঁচ লাগিলে দেশের এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত সমস্ত নগর গ্রাম পল্লী অগ্নি উজ্জ্বলন করিয়া গর্জ্জন করিতে থাকে; ভারতবর্ষে বাঙ্গালির দুর্দ্দশা দেখিয়া খোট্টা হাসে—খোট্টার দুর্দ্দশা দেখিয়া বাঙ্গালি হাসে; হিন্দুর দুর্দ্দশা দেখিয়া মুসলমান হাসে, মুসলমানের দুর্দ্দশা দেখিয়া হিন্দু হাসে; সমস্ত ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা দেখিয়া 'হুতোম পেঁচা' হাসে আর বলে—"ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা"। এই গেল মনের ঐক্য; তা বই আমা-

দের দেশে যত কিছু দলাদলির তর্জ্জন গর্জ্জন সমস্তই জাতি কুল লইয়া; দেশের সঙ্গে যাহার মূলেই কোনো সম্পর্ক নাই!

ইউরোপ দেশীয় মর্য্যাদার উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে; আমাদের দেশ জাতীয় মর্য্যাদার উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া বর্ত্তমান হইতে অতীতে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে। দুয়ের মধ্যে কেবল যদি ভাবের মাত্র প্রভেদ হইত তাহা হইলে কোনো চিন্তা ছিল না; একজন নয় ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিতেছেন—আর এক জন নয় অতীত লক্ষ্য করিতেছেন, তাহাতে কি? বর্ত্তমান হইতে অতীতও যতদূর ভবিষ্যৎও ততদূর! চিন্তার বিষয় এখানে এই যে, দুয়ের মধ্যে শুধু ভাবের প্রভেদ নয়—কিন্তু কাজের প্রভেদ। দেশীয় ভাবের উদ্দীপনে যেমন কাজ হয়—জাতীয় ভাবের উদ্দীপনে তাহার সিকির সিকিও হয় না, উল্টা বরং কাজের ক্ষতি হয়; কেন না, স্বাধীন দেশে দেশের উন্নতি-সাধনে দেশীয় সকল ব্যক্তিরই সমান অধিকার; পক্ষান্তরে, কৃত্রিম ধর্ম্মবন্ধনে হাত-পা বাঁধা জাতির উন্নতি-সাধনে জাতীয় ব্যক্তিদিগের কাহারো কোনো হস্ত নাই; পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করিয়া আসিয়াছেন, জাতির নিকটে তাহাই কর্ত্তব্য, পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা বলিয়া আসিয়াছেন জাতির নিকটে তাহাই বেদবাক্য। জাতির জাতিত্ব অতীতের উপরে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত—এবং তাহার সম্মুখে ভবিষ্যতের দ্বার একেবারেই অবরুদ্ধ।

ভূতকালের স্মরণ এবং ভবিষ্যতের উন্নতি, এ দুয়ের মধ্যস্থলে বর্ত্তমানের সাধনা। পর্ব্বত হইতে যেমন নদী উপত্যকায় নামিয়া আসে, ভূতকালের স্মরণ তেমনি আপনা আপনি বর্ত্তমানে নামিয়া আসে;—আর আপনা আপনি যাহা নামিয়া আসে তাহাই

কাজের; তা ছাড়া অতীতের আর যাহা কিছু—সমস্তই অন্ধকেরে উপন্যাস-জল্পনা। ভবিষ্যতের উন্নতি কিন্তু কোথা হইতেও নামিয়া আসে না; তাহা সাধনাকে অপেক্ষা করে, পুরুষের কর্তৃত্বকে অপেক্ষা করে। ইংলণ্ডে কেহই Magna chartaর নামও করে না—কি জন্য করিবে? Magna charta ইংলণ্ডে মৃত স্মরণের বস্তু নয়—তাহা জীবন্ত সাধনের বস্তু! Magna charta ইংলণ্ডের পথে ঘাটে মাঠে হাটে জলদক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে—জনপদের প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে চলা ফেরা করিতেছে; ইংলণ্ডের চক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ দেদীপ্যমান! যাহা প্রত্যক্ষ দেদীপ্যমান তাহার জন্য স্মরণের চাবি হাতে করিয়া চোরের ন্যায় ভূতকালের অন্ধিসন্ধি হাতড়াইয়া বেড়াইবার কোনো প্রয়োজন করে না। আমাদের দেশের অতীত-কালের স্মরণীয় উপন্যাস যত কিছু সমস্তই অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক-পরম্পরায় নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিতেছে—পুরুষদিগকে তাহার জন্য ভাবিতে হইবে না; বর্ত্তমানের সাধনাই পুরুষ-জাতিকে শোভা পায়। বর্ত্তমানের কাজের কথা ছাড়িয়া ভূতকালের উপন্যাস-জল্পনা অতিবৃদ্ধা পিতামহীর মুখেই—অতি সুকুমার কচি বালকের কর্ণেই—শুনায় ভাল। ইউরোপীয়দিগের ভরসা living present, জীবন্ত একাল! আমাদের ভরসা dead past, মৃত সেকাল; দুয়ের মধ্যে কি বিশাল ব্যবধান!

বলিলাম "মৃত সেকাল"—কিন্তু এ কথাটির একটু টীকা করা আবশ্যক। সে কালেরই হউক আর একালেরই হউক যাহা ভাল জিনিস্ তাহা মরে না—মরিতে কেবল বাজে জিনিস্ই মরে, ফালতো জিনিস্ই মরে। মরিতে কেবল শরীরই মরে—আত্মা মরে না।

বেদের শরীর অনেককাল যাবৎ মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার আত্মা আজিও সজীব রহিয়াছে;—যাগযজ্ঞের মন্ত্রতন্ত্র মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু উপনিষদের ধর্ম্ম নব-জীবন হইতে নবতর জীবনে দিন দিন সমুত্থান করিতেছে। ইংলণ্ডের বৈরতন্ত্র (Feudal system) অনেককাল মরিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার Magna charta আজিও জাগ্রত জীবন্ত। পুরাণ তন্ত্রাদিকেই আমরা সেকালের সামগ্রী বলিতে পারি; পুরাণ শব্দের অর্থই হ'চ্চে পুরাতন অথবা যাহা একই কথা সেকেলে; কিন্তু উপনিষদ্ ভগবদ্গীতা প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের শাস্ত্র-গুলিকে আমরা সেকেলে বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না;—এ-গুলির উৎপত্তি সেকালে হইলেও এগুলি সেকেলে নহে—এগুলি সব-কেলে; এগুলি পুরাতন নহে—এগুলি সনাতন। সেকেলে হিন্দু-ধর্ম্ম কি? না—বৈদিক যাগযজ্ঞাদি, পৌরাণিক অবতার পূজাদি, তান্ত্রিক প্রতিমা পূজাদি; সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কি? না—উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান; ভগবদ্গীতার ভগবদ্ভক্তি এবং নিষ্কাম কর্ম্ম; এবং ঐরূপ আর আর উচ্চাশয় শাস্ত্রের যে-সকল মহাবাক্য সর্ব্বকালেই এবং সর্ব্বদেশেই লোকের পূজা আকর্ষণ করে, সেই সকল অমূল্য রত্ন। কিন্তু শাস্ত্রের অগাধ সমুদ্র হইতে সেই সকল মহাবাক্য উদ্ধার করিতে পারে—এমন ডুবুরী আমাদের দেশে কয় জন? ডুবুরী যদিবা রত্ন উদ্ধার করিল—তাহা চিনিতে পারে এমন জহরীই বা আমাদের দেশে কয় জন?*

---

* আমাদের দেশের জনসাধারণ যে কিরূপ জহরী, কিরূপ সমজ্দার, তাহার পরিচয় আমি অনেকবার অনেক রকমে পাইয়াছি। তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি; ব্রাহ্মসমাজের কোনো উৎসব উপলক্ষে বোম্বাই প্রদেশের একটা দেশীয় রাগিণীর একটি গীত ভাঙিয়া একটি ব্রহ্মসঙ্গীত প্রস্তুত করিয়া তাহা

আমাদের দেশ একটা প্রকাণ্ড রথ; তার সারথী হ'চ্চে সেকেলে শাস্ত্র, আর অশ্ব হ'চ্চে লোকাচার। সারথীটি বার্দ্ধক্যের বশতাধীনে এমনি অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছেন যে, তিনি

সভাস্থলে গান করা হইয়াছিল; তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের প্রায় সকলেরই এইরূপ ধারণা হইল যে, সে গীতের স্বর নিশ্চয়ই ইংরাজি স্বর। বাঙ্গালা এবং হিন্দুস্থানী গীত যাহা আমাদের দেশের কাণে চিরাভ্যস্ত—এ দেশীয় লোকের ধ্রুব সংস্কার যে. তাহাই বিশুদ্ধ প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সামগ্রী; তাহার একটু এদিক্ ওদিক্ হইলে—আমাদের দেশের লোক তাহাকে একেবারেই বিলাতের আমদানি বলিয়া স্থিরস্থার করিয়া বসিয়া থাকেন! বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, পশ্চিম প্রদেশীয় পণ্ডিতদিগের সংস্কৃত উচ্চারণ শুনিলে হয় তো বা কৃপার্দ্রচিত্তে আপনাদের মধ্যে এইরূপ বলাবলি করিতেন যে, "এরা খোট্টা মানুষ এদের সংস্কৃত উচ্চারণ কত আর ভাল হইবে।" আমাদের দেশের লোকের এটা জানা উচিত যে, দাক্ষিণাত্য প্রদেশ মুসলমানদিগের পরাক্রমের সংস্পর্শ হইতে অনেক পরিমাণে নির্লিপ্ত ছিল. এই জন্য যদি বিশুদ্ধ প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সামগ্রী কোথাও থাকে তবে সেই সব অঞ্চলের গলিঘুজিতে লুকাইয়া থাকিবারই কথা। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় নৃত্যগীত মুসলমান রাজাদের বৈঠকী নৃত্যগীত হইতে—খেয়াল ধ্রুপদ টপ্পা এবং বাইনাচ প্রভৃতি হইতে—অনেক বিভিন্ন ছিল—তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই; তাহার সাক্ষী—কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের গীতাংশের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই এমনিসব নূতন-তরো নাম যে—তাহাদের কাহার যে কি অর্থ তাহা এক্ষণকার গীতের বড় বড় ওস্তাদেরাও বলিতে পারেন না। এদেশের পুরাতন-প্রণালীর নৃত্যগীতকে লোকে যে ইউরোপীয় ঢঙের নৃত্য গীত বলিবে তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই; কেননা আর্য্য জাতিগণের গোড়ায় একতা বিদ্যমান ছিল ইহা যদি সত্য হয়, তবে তাহার অস্ফুট আভাস কালের পর্দার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে চম্‌কানি দিবে—ইহা তো হইতেই পারে। আমাদের দেশের বিশুদ্ধ ভারতবর্ষীয় (অর্থাৎ অযাবনিক) গানের স্বর শুনিলে লোকে তাহা ধরিতে পারে না—ধরিতে না পারিলেই তাহাকে ইংরাজি স্বর বলিয়া খোঁটা দেয়; তেমনি আমাদের দেশের লোক আদিম কালের উপনিষদাদির পরিষ্কার ব্যাখ্যান শুনিলে তাহাকে আধ-খ্রীষ্টানি বলিয়া খোঁটা দেয়। আমরা এমনি অসাধারণ সমজদার লোক যে, আমাদের নিকটে পুরাণ-তন্ত্রাদির ধর্ম্মই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম; বাস্তবিক সনাতন ধর্ম্ম যে উপনিষদাদির মথিত সারাংশ তাহা আমাদের নিকটে খ্রীষ্টান ধর্ম্মেরই সামিল।

অশ্বকে চালা'ন কিম্বা অশ্ব তাঁহাকে চালায়—তাহা বলা কঠিন! তাতে আবার সারথীও দশ গণ্ডা, অশ্বও দশ গণ্ডা; অশ্ব—নানা প্রদেশের নানা বিরোধী লোকাচার, সারথী নানা মুনির নানা বিরোধী শাস্ত্র; সারথীদিগের হাতের রাস আল্‌গা হইয়া লট্‌পট্‌ করিতেছে—তাহা যে তাঁহাদের হাত হইতে খসিয়া পড়ে নাই—এই ঢের! দশগণ্ডা ঘোড়া দশদিকে রুখিয়া পা ছোড়াছুড়ি করিতেছে—দশগণ্ডা সারথী সামাল্‌ সামাল্‌ বলিয়া চীৎকার করিতেছে—রথ-বেচারী কোন্‌দিকে যাইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া যেথানকার সেইখানেই স্থির রহিয়াছে। রথের এইরূপ গতিরোধ অপ্রতীকার্য্য দেখিয়া আরোহীদিগের (অর্থাৎ ভারতবাসীদিগের) মনোরথেরও গতিরোধ হইয়া আসিতেছে—তাঁহাদের আশা ভরসা সকলি লোপ পাইয়া আসিতেছে।

আমাদের দেশের পূর্ব্বাপর ঐতিহাসিক রহস্যে একটু ডুব দিয়া তলাইয়া দেখিলেই আমাদের দেশের রোগের মূল যে কোন্‌খানটিতে তাহা চিকিৎসকের চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়িবে। রোগটি বড় সহজ নয়—তাহা পক্ষাঘাত বিশেষ।

বৈদিক সময়ে আমাদের দেশের পিতৃপুরুষদিগের মনে কৃত্রিমতার আবরণ যেমন ছিল না বলিলেই হয়, এখন আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় ঠিক্‌ তার বিপরীত! এখন দেখিতে পাওয়া যায়—খাওয়া দাওয়া, ওঠা বসা, চলা ফেরা সকলই কৃত্রিম ধর্ম্মাবরণে আবৃত! কৃত্রিম শব্দের অর্থ এখানে কপট নহে; যাহা সহজ-শোভন নহে—যাহা কষ্ট-কল্পিত—তাহারই নাম কৃত্রিম—ইংরাজিতে যাহাকে বলে artificial। যেখানেই দেখিবে—কড়াক্কড় কৃত্রিম ধর্ম্মশাসনের বেশী বাঁধাবাঁধি আঁটাআঁটি, সেই-খানেই জানিবে বজ্রের বাঁধন ফস্কা গিরে;—অমুক বয়স হইতে

অমুক বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিবে; অমুক বয়স হইতে অমুক বয়স পর্য্যন্ত অমুক দণ্ডে দেবারাধনা করিবে, অমুক দণ্ডে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে, অমুক দণ্ডে অধ্যয়ন অধ্যাপন করিবে, অমুক দণ্ডে অতিথিসৎকার করিবে, অমুক বয়সে বনে যাইবে—বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ করিবে—এইরূপ শক্তাশক্তি কৃত্রিম ধর্ম্মশাসনের ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে;—কি? না ছেলে-খেলা! তাহার সাক্ষী—বারো বৎসরের ব্রহ্মচর্য্য এক্ষণে তিন দিনে সাঙ্গ হইয়া যায়; সন্ধ্যাবন্দনা দেবারাধনা পিতৃতর্পণাদি কতকগুলি মুখস্থ শব্দ উচ্চারণ মাত্র; এবং পূজা উৎসবাদি আর কিছু নয়—পুরোহিতকে দিয়া কতকগুলি তন্ত্রোক্ত মন্ত্রতন্ত্র আওড়াইয়া লওয়া,—একপ্রকার রোজাকে দিয়া ভূত ঝাড়ানো!

যেমন বলিলাম—বৈদিক কালে—ঋষিদিগের দেবতা-স্তব তাঁহাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস ছিল; তাহা মুখস্থ চর্ব্বিত-চর্ব্বন ছিল না; তাঁহাদিগকে কেহই নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইত না। ক্রমে হইল অমুক সময়ে অমুক যজ্ঞে অমুক মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে—অমুক যজ্ঞে অমুক প্রকার বেদী নির্ম্মাণ করিতে হইবে—অমুক যজ্ঞে এইরূপ পশু এবং এতগুলা পশু এইরূপে হত্যা করিতে হইবে—এইরূপ কত যে বাল্যক্রীড়া তাহার আর সীমা পরিসীমা নাই! বুদ্ধদেবের নাস্তিক্য অপবাদের কারণ আর কিছুই না—তিনি যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; তা বই—তাঁহার প্রদত্ত ধর্ম্মোপদেশ পাঠ করিলে কথনই এ কথা কাহারো মনে তিলার্দ্ধও স্থান পাইতে পারে না যে, তিনি নাস্তিক ছিলেন। খুব সম্ভব যে, তিনি তৎকালের লৌকিক প্রথানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করাতে তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরা সেইদিকে

আর একটু বেশী মাত্রা ঝোঁক দিয়াছিলেন, সেই গতিকে চারি-দিকে এইরূপ একটা মিথ্যা অপবাদ রটিয়া গেল যে, বুদ্ধদেব নাস্তিক। বুদ্ধদেবের তপস্যার প্রভাবে সার্ব্বলৌকিক এবং সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম আমাদের দেশে সেই যা একবার চকি-তের ন্যায় বিকসিত হইয়াছিল—দেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় বন্ধন দূরীভূত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে ভারত-ব্যাপী দেশীয় ঐক্য-বন্ধন অভিব্যক্ত হইবার শুভযোগ সেই যা একবার দেখা দিয়াছিল! কিন্তু হইলে হইবে কি—তখনকার সেই সৌভাগ্যের কাল আমাদের দেশের ভাবি দুর্ভাগ্যের বীজ-বুনানির মুখ্য সময়—সাময়িক কার্য্য সময়ে হওয়া চাই—সেই মুখ্য সময়টিতে যদি দুর্ভাগ্যের বীজ-বুনানি না হইবে তবে আর কখন্ হইবে;—অতএব দেও বুদ্ধকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া—বুদ্ধের দলকে, বুদ্ধের ধর্ম্মকে, বুদ্ধের শাস্ত্রকে, বুদ্ধের কীর্ত্তিকলাপকে, দেশ হইতে দূর করিয়া দেও! যাগযজ্ঞের ধূমপটল আকাশে উত্থিত হউক! অনেক বৎসরের উপবাসের পরে দেবতাদিগের গৃহে গৃহে ভোজের ধূম লাগিয়া যা'ক্! ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের শুষ্ক মুখ হর্ষ-কিরণে সমুজ্জ্বল হউক্! এইরূপ ব্রাহ্মণদিগের অমোঘ আশীর্ব্বাদে অতি অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের আধিব্যাধা নির্ব্যথা হইয়া গেল—সার্ব্ব-লৌকিক ধর্ম্মের চিহ্ন মাত্রও রহিল না—জাতির জাতিত্ব এবং কুলের কুলীনত্ব হিমালয় ছাড়াইয়া উঠিতে লাগিল! আবার আমাদের দেশ যে-কে-সেই! পুরাবৃত্তের অঙ্কুর গজাইতে সবেমাত্র যেই আরম্ভ করিয়াছে, আর অমনি তাহা প্রচণ্ড বিদ্বেষানলে দগ্ধ হইয়া তদ্দণ্ডেই শুখাইয়া মরিল। এক দিকে "আমি ব্রাহ্মণ আমি মস্ত লোক" "আমি ক্ষত্রিয়

আমি মস্ত লোক” এইরূপ কৌলিক বড়ত্ব, আর-এক দিকে “আমি শূদ্র আমি ক্ষুদ্র লোক” এইরূপ কৌলিক ছোটত্ব, এক দিকে প্রভাব-পক্ষীয় তাড়িত-প্রবাহ—আর-এক দিকে অভাব-পক্ষীয় তাড়িত-প্রবাহ—দুয়ের বেগাতিশয্যের মাঝখানে পড়িয়া জন-সমাজের হস্তপদ অসাড় হইয়া যাইতে লাগিল। এই-গতিকে পুরাবৃত্ত বলিয়া একটা যে বিজ্ঞান-সামগ্রী তাহা আমাদের দেশে জন্মিতেই অবসর পাইল না। কৃত্রিম খাঁচার ধর্ম্ম-বন্ধনে লোকের হাত পা বাঁধা থাকিলে কেহই স্বাধীন-ভাবে কোনো কার্য্য করিতে পারে না;—আর, যে কার্য্য স্বাধীন-ভাবে কৃত না হয়—পুরাবৃত্তের বাজারে সে কার্য্যের বিশেষ কোনো মূল্য থাকিতে পারে না। রাজারা প্রত্যূষ হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত কোন্ মুহূর্ত্তে কি কাজ করিবেন তাহা শাস্ত্রে সবিস্তরে বিধিবদ্ধ রহিয়াছে,—যে রাজা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা মানিয়া চলিলেন, সেই রাজা অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিলেন, আর, যিনি তাহার এক চুল এদিক্ উদিক্ করিলেন তিনি ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলেন! এইরূপ যেখানে কৌলিক প্রথা মানিয়া চলা-না-চলার উপরে রাজাদের সমস্ত খ্যাতি-অখ্যাতি যশ-অপযশ নির্ভর করে, সেখানে কাজেই জাতির গুণাগুণই ব্যক্তির গুণাগুণের একমাত্র পরিচায়ক এবং পরিমাপক হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ অবস্থায় কোনো ব্যক্তির নিজের কোনো স্বাধীন কীর্ত্তি ইতিহাসে প্রবেশ করিতে পথ পায় না। কালিদাসের রঘুবংশে সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের গুণ-বর্ণনায় যেমন দেখিতে পাওয়া যায়—“যথা-বিধিহুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাং যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকাল-প্রবোধিনাং রঘূনামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্বিভবোঽপি সন্” এই-রূপ শাস্ত্রীয় বন্ধনে বাঁধাসাঁধা কার্য্য ছাড়া, স্বাধীন-ভাবে কোনো

রাজা যদি খুব একটা ভাল কার্য্যও অনুষ্ঠান করেন, (যেমন বুদ্ধদেব করিয়াছিলেন), তবে তাহা এদেশের পুরাতন পথাবলম্বী ইতিহাস-লেখকের গ্রাহ্যের মধ্যেই আসিতে পারে না।

লোকের বড়ত্ব ছোটোত্বের দুইটি বিভিন্ন ধরণের পরিমাণ দণ্ড—জন্ম এবং কর্ম্ম; জাতি এবং কীর্ত্তি; ভূধাতু এবং কৃ ধাতু। আমাদের দেশে ভূধাতু কৃ-ধাতুর হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে এমনি একটা কাটের পুতুল বানাইয়া তুলিয়াছে যে, আমাদের এখানে কৃ ধাতুকে লইয়া যত কিছু নাড়াচাড়া—যত কিছু ক্রিয়াকর্ম্মের আড়ম্বর—সমস্তই একপ্রকার পুৎলোবাজিরই সামিল। আগা-গোড়া সবই তারে-ঝোলানো কাটের পুতলের কাণ্ড—তা'র আবার ইতিহাসই বা কি আর পুরাবৃত্তই বা কি! কথাটি এই যাহা বলিলাম, ইহা আমার নিজের মনঃকল্পিত কথা নহে—ইহা শাস্ত্রেরই প্রতিধ্বনি। কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ঐরূপ মর্ম্মবেদনার দীর্ঘনিশ্বাস সকল শাস্ত্রেরই প্রাণের মধ্য হইতে ভূয়োভূয় বাহির হইতে দেখা যায়। দেখ না কেন—রাশি রাশি মুখস্থ শাস্ত্র-বচনের এবং অসংখ্য খুঁটিনাটির ভারে প্রপীড়িত হইয়া—কর্ম্ম এমন যে ভাল সামগ্রী, তাহাও আমাদের দেশে একপ্রকার যন্ত্রণা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশের শাস্ত্রানুশাসিত কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ড লোকের স্বাধীন স্ফূর্ত্তির এমনি ব্যাঘাত উৎপাদন করে যে, কি দর্শন কি পুরাণ কি তন্ত্র সকল শাস্ত্রই একবাক্যে কর্ম্মের নাম দিয়াছে—কর্ম্ম-বন্ধন। প্রতীচ্য ভূখণ্ডে আলস্য এবং জড়তাই বন্ধন বলিয়া লোকের নিকটে পরিচিত; তার সাক্ষী—shackles of indolence অবসাদের শিকল; আর, কর্ম্মই কেবল সেই জড়তার বন্ধন খুলিয়া দিতে পারে,—তা ছাড়া আর কেহই তাহা পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে একি বিপরীত—কর্ম্ম নিজেই বন্ধন বলিয়া

পরিগণিত হয়! যিনি বন্ধন খুলিয়া দিবেন তিনি নিজেই যদি বন্ধন হইলেন—যিনি রক্ষক তিনিই যদি ভক্ষক হইলেন—তবে আর বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধারের উপায় কি? কর্ম্ম-মাত্রই যদি বন্ধন হয় তবে কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য কর্ম্ম করিলে দ্বিতীয় কর্ম্মটিও বন্ধন হইয়া দাঁড়ায়। যদি বলো সংসারের কর্ম্ম-বন্ধন ঘুচাইবার জন্য তপজপাদির সাধন আবশ্যক, তবে তপ-জপাদি কর্ম্মের বন্ধন ঘুচাইবার জন্য তৃতীয় কর্ম্ম সাধনের আবশ্য-কতা অস্বীকার করিতে পারো না; কেননা—তুমি বলিয়াছ কর্ম্মমাত্রই বন্ধন; তপজপাদি না হয় সোণার বন্ধন, চুরি-ডাকাতি না হয় লোহার বন্ধন; কিন্তু বন্ধন দুইই। হদ্দ তুমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পার যে, সৎ কর্ম্ম করিলে অসৎ কর্ম্মের লোহার শৃঙ্খল খুলিয়া গিয়া তাহার স্থানে সোণার শৃঙ্খল জড়ানো হয়; কিন্তু তাহাতে কি? লোহার শৃঙ্খলের পরিবর্ত্তে সোণার শৃঙ্খল জড়া-নোকে কিছু আর মুক্তিসাধনের উপায় বলা যাইতে পারে না। একটা পক্ষীকে লোহার পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া সোণার পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাকে কিছু আর মুক্তি দেওয়া হয় না। অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, কর্ম্ম-মাত্রই কর্ম্ম-বন্ধন, তবে অগত্যা এইরূপ দাঁড়ায় যে, মুক্তির জন্য যতই যিনি সাধ্য-সাধনা করিবেন ততই তিনি বন্ধনে জড়িত হইয়া পড়িবেন। যে ব্যক্তি সাঁতার জানে না সে যেমন জলে পড়িলে কূলে ফিরিয়া আসিবার জন্য যতই হাত পা ছোড়াছুড়ি করে ততই দূরে দূরে ভাসিয়া যায়—হাত পা না ছুড়িলে নীচে তলাইয়া যায়; তেমনি, মুক্তির জন্য সাধনা করিলেও কর্ম্মবন্ধন—না করিলেও স্বভাব-সুলভ সংসার-বন্ধন—বন্ধনের হস্ত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। ভাবিয়া

দেখিলে দাঁড়ায় এই যে, "কর্ম্মমাত্রই কর্ম্মবন্ধন" এটা কেবল একটা অত্যুক্তি-অলঙ্কার; শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় তাহা নহে। শাস্ত্রে কেবল দুইরূপ কর্ম্ম কর্ম্মবন্ধন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে—(১) কাম্য কর্ম্ম অর্থাৎ ফল-কামনা করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় যেমন যাগযজ্ঞাদি; (২) নিষিদ্ধ কর্ম্ম যেমন চুরিডাকাতি। এ ভিন্ন তৃতীয় আর-এক প্রকার কর্ম্ম আছে;—কি? না নিষ্কাম কর্ম্ম; শাস্ত্রে বলে—আর যুক্তিতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়—যে, এই তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম (নিষ্কাম কর্ম্ম) বন্ধনের কোটায় স্থান পাইতে পারে না।

আমাদের দেশের প্রবীণ পরামর্শদাতাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, মুখে অথবা হাতে কাম্য কিম্বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া মনে তাহাকে আমল না দিলেই—তাহা নিষ্কাম কর্ম্মের পদবীতে সমুত্থান করে! ইঁহারা বলেন—এই বিড়াল বনে গেলেই যেমন বন-বিড়াল হয়, তেমনি কাম্য অথবা নিষিদ্ধ কর্ম্ম নিষ্কাম-ভাবে কৃত হইলেই তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়; তা ছাড়া—নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীর কোনো কর্ম্ম নাই! শাস্ত্রে কিন্তু আর এক কথা বলে—সকল শাস্ত্রেই বলে যে, কায়মনোবাক্যের একতা নিষ্কাম এবং সকাম উভয়-বিধ ধর্ম্মেরই—ধর্ম্ম-মাত্রেরই—একটি প্রধান পরিচয়-লক্ষণ; তা বই—মুখে এক, মনে আর অথবা কাজে আর—এ-ভাবের কার্য্য ধর্ম্মই নহে;—না তাহা কাম্য কর্ম্ম—না তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম; তাহা নিষিদ্ধ কর্ম্মেরই শ্রেণী-ভুক্ত। চতুর পরামর্শদাতাকে একজন খাঁটি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ বলিতে পারেন যে, "তুমি বলিতেছ—মুখে পুত্রং দেহি ধনং দেহি এবং মনে 'কিছু দিতে হবে না মা—ছেড়ে দেহি' ইহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম!—মানিলাম যে, তোমার মনের মধ্যে ধনের

কামনা নাই—পুত্রের কামনা নাই, যশের কামনা নাই; কিন্তু মায়া-ভক্তি দেখাইয়া লোকের মন ভুলাইবার কামনা আছে তো! এটা তো আর তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না!” আমরা তাই বলি যে, নিষ্কাম কর্ম্ম কাম্য এবং নিষিদ্ধ উভয় শ্রেণীর কর্ম্ম হইতে ভিন্ন—তৃতীয় আরেক শ্রেণীর কর্ম্ম। কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের মূল-প্রবর্ত্তক—সংসারাসক্তি; নিষ্কাম কর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক—বৈরাগ্য, অথবা যাহা একই কথা—ভগবদ্‌ভক্তি।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় নিষ্কাম-কর্ম্ম—ভূয়োভূয় উপদিষ্ট হইয়াছে। ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ কেবল কর্ত্তব্যবোধে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। যথা;—ভগবদ্গীতা বলেন “কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন সঙ্গংত্যক্‌ত্বা ফলঞ্চৈব সত্যাগো সাত্ত্বিকো মতঃ!” “কর্ত্তব্য” এইরূপ বোধে বিষয়াসক্তি এবং ফল-কামনা পরিত্যাগ করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই নাম—সাত্ত্বিক ত্যাগ। ফল-কামনা-শূন্যতা এবং বৈরাগ্য—কথা একই কেবল ভাষা ভিন্ন।

ফল-কামনা-শূন্যতা এবং বৈরাগ্যের নাম শুনিলে অনেকে মনে করেন যে, তাহার মধ্যে রস কস কিছুই নাই, তাহার শরীর কাষ্ঠ পাষাণে গঠিত। তাঁহারা ভাবেন, বৈরাগ্য শব্দের অর্থই হ’চ্চে অনুরাগের ঠিক্ উল্টো—মুখ-শিট্‌কোনো বিরাগ! কিন্তু ভিতরের নিগূঢ় বৃত্তান্ত যাঁহারা জানেন তাঁহাদের কাছে, বৈরাগ্য অনুরাগ সোপানের সর্ব্বোচ্চ মঞ্চ; তাঁহাদের কাছে—বৈরাগ্যের আগাগোড়া সবই অনুরাগ—বৈরাগ্য অনুরাগ ছাড়া আর কিছুই নহে। জল যেমন অগ্নিতে পরিশুদ্ধ হইলেই বাষ্পাকারে আকাশে সমুত্থিত হয়, অনুরাগ তেমনি জ্ঞানানলে পরিশুদ্ধ হইলেই বৈরাগ্যের মুক্ত সমীরণে সমুত্থিত হয়। লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস যে,

বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করা, আর সর্ব্বত্যাগী হওয়া, একই কথা; এ কথাটির মধ্যে সত্য কেবল এইটুকু যে, বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিতে হইলে অভিনবব্রতীকে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতেই হয়; কিন্তু ত্যাগ স্বীকারের একটি গোড়ার কথা এখানে ভুলিলে চলিবে না—সেটি এই যে, লোকে ত্যাগ স্বীকার করিব বলিয়া ত্যাগ স্বীকার করেও না—করিতে পারেও না। ত্যাগ স্বীকার যিনি যখন করেন, তখন, একটা বিষয়ের ভালবাসা সূত্রেই আর-একটা বিষয়ের ত্যাগ স্বীকার করেন; কেহ বা পরিবারের মঙ্গলার্থে ত্যাগ স্বীকার করেন, কেহ বা কুলের মঙ্গলার্থে, কেহ বা দেশের মঙ্গলার্থে, কেহ বা সাধারণতঃ মনুষ্যের মঙ্গলার্থে। যে বিষয়ের ত্যাগ স্বীকার করা হইতেছে তাহার প্রতি বৈরাগ্যের উৎপত্তি এবং যাহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা হইতেছে তাহার প্রতি অনুরাগের টান, এ দুই ব্যাপার ছায়াতপের ন্যায় পরস্পর-সাপেক্ষ——অর্থাৎ দুয়ের একটিকে ছাড়িয়া আর একটি একাকী থাকিতে পারে না।

অনুরাগের সহিত বৈরাগ্যের যখন এইরূপ মাখামাখি সম্বন্ধ তখন অনুরাগের অবতারণা-ব্যতিরেকে বৈরাগ্যের আলোচনা কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না ইহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে; এই জন্য আমরা প্রথমে অনুরাগের কতগুলা সিঁড়ির ধাপ, এবং কাহার উপরে কোন্‌টি সমুত্থিত, তাহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি; তাহার পরে সেই সিঁড়ি ভাঙিয়া কিরূপে বৈরাগ্য-মঞ্চে উত্থান করিতে হয়, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে।

অনুরাগ-সোপানের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই কয়টি পংক্তি, অর্থাৎ পঁইটে, উপর্য্যুপরি সাজানো রহিয়াছে;—(১)

প্রাণানুরাগ অর্থাৎ আপনার শারীরিক প্রাণের প্রতি অনুরাগ; (২) গৃহানুরাগ অর্থাৎ পরিবারের প্রতি অনুরাগ (পরিবার একপ্রকার মানসিক প্রাণ ইহা বলা বাহুল্য); (৩) কুলানুরাগ অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি গোষ্ঠীর প্রতি অনুরাগ; (৪) দেশানুরাগ; (৫) সর্ব্বভৌমিক অনুরাগ অর্থাৎ সার্ব্বদৈশিক মনুষ্যের প্রতি অনুরাগ; (৬) ঈশ্বরানুরাগ। এই অনুরাগ সোপানে—যিনি যেমন ব্যক্তি তিনি সেইরূপ পংক্তিতে অবস্থিতি করেন; কেহ বা নীচের পংক্তিতে অবস্থিতি করেন, কেহবা উপরের পংক্তিতে অবস্থিতি করেন; আবার, প্রত্যেক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে অবস্থিতি করেন। নীচের পংক্তির লোক বড় জোর একধাপ উচ্চ পংক্তির লোকের ভাব বুঝিতে পারে; তা বই, দুই তিন ধাপ উচ্চ পংক্তির লোকের—ভাব বুঝিতে পারা দূরে থাকুক—ভাষাই বুঝিতে পারে না। ইহুদীরা যৎকালে স্বজাতীয় অনুরাগের গণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল, ঈসা তখন সার্ব্বলৌকিক মনুষ্যানুরাগের মঞ্চ হইতে তাহাদিগকে কত না সদুপদেশ প্রদান করিলেন—সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইল। একই অভিন্ন কারণে ঈসাকে ইহুদীরা এবং বুদ্ধদেবকে ভারত-বাসীরা নিতান্তই পর ভাবিল; সে কারণ আর কিছু না—নীচের পংক্তির লোক দুই তিন ধাপ উচ্চ পংক্তির লোকের ভাবও বুঝিতে পারে না—ভাষাও বুঝিতে পারে না। বুদ্ধ-দেবকে লোকে তো নাস্তিক বলিয়া উড়াইয়াই দিল—তাঁহার অপরাধ এই যে, তিনি বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অলীকতা ঘোষণা করিয়া ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেবতাগণকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন! কোনো কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ অনুমান করিয়া থাকেন যে, ঈসার ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই একটি প্রচ্ছন্ন উপ-

শাখা; সে যাহাই হৌক্—দোঁহার প্রবর্ত্তিত দুই সার্ব্বলৌকিক ধর্ম্ম পৃথিবীর দুই মধ্যস্থান হইতে দুই প্রান্ত-স্থানে ছট্‌কিয়া পড়িল—বুদ্ধের ধর্ম্ম পূর্ব্ব প্রান্তে ছট্‌কিয়া পড়িল—ঈসার ধর্ম্ম পশ্চিম প্রান্তে ছট্‌কিয়া পড়িল।

আর, পৃথিবীর সেই দুই প্রান্তেই লোকেরা স্বাধীন রাজ্যে বাস করিয়া সম্মানের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। শুধু ইতিহাস দেখিলে কি হইবে—ইতিহাসের রহস্যটির ভিতর একবার একটু মনোযোগের সহিত তলাইয়া দেখো;—তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, একই অপরাধে ঈসা ক্রুসে বিদ্ধ হইলেন এবং বুদ্ধ সশরীরে না হউক্ সদলে দ্বীপান্তরিত হইলেন। সে অপরাধ আর কিছু না—লোকদিগকে কৃত্রিম ধর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা সমর্থন করিতে যাওয়া! যাগ-যজ্ঞাদি অলীক ক্রিয়াকাণ্ডের বন্ধন মোচন করিয়া ভারতবাসী লোকদিগকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা প্রদান করা বুদ্ধের হৃদ্গত সংকল্প ছিল, এবং ফারিসীয় সম্প্রদায়ের কৃত্রিম ধর্ম্মশাসনের শৃঙ্খল ছেদন করিয়া ইহুদী জাতিকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা প্রদান করা ঈসার হৃদ্গত সংকল্প ছিল। কিন্তু কালের কঠোর শাসনে বুদ্ধের ধর্ম্ম ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মূল উৎপাটন করিয়া লইয়া ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল—ঈসার ধর্ম্ম ঘূর্ণাবায়ুর ন্যায় ইহুদী জাতিকে উড়াইয়া ছড়িভঙ্গি করিয়া জেরুসালেমকে শ্মশান করিয়া ফেলিল।

যে দিন বুদ্ধের ধর্ম্ম ভারতী মাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া পূর্ব্ব-সাগরে ঝম্প প্রদান করিল, সেই দিন মাতা ভারতী রোষে অধীর হইয়া প্রকম্পিত অধরে তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি সন্তানগণকে বলি-

লেন—"বুদ্ধ-দেব তোমাদিগকে ভালবাসিয়া তোমাদের হস্ত পদ হইতে কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের বন্ধন মোচন করিয়া তোমাদের মৃত শরীরে জীবন সঞ্চার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—তাই তোমরা তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে!—বুঝিয়াছি—তোমরা মুক্তি চাও না—তোমরা চাও বন্ধন! তথাস্তু! তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক্! স্বাধীনতা তোমাদের অত্যাচার হইতে পলাইয়া বাঁচিয়া অস্পর্শীয় ম্লেচ্ছদিগের গৃহ উজ্জ্বল করুক্! যেমন তোমরা বন্ধন-প্রিয়—তেমনিই তোমাদের দশা হউক্—সেই ম্লেচ্ছদিগের দাসত্ব-শৃঙ্খল জন্ম-জন্ম তোমাদের কণ্ঠের হার হউক্!" দেখিতে না দেখিতে ভারতের প্রলয়-মেঘ মুসলমান-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ জুড়িয়া তলোয়ারের বিদ্যুৎক্রীড়া এবং মস্তকের শিলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল—সেই এক দিন! এবং তাহার পরে গৌরাঙ্গ দেবতারা বজ্রধ্বনিতে দশদিক্ ফরসা করিয়া লোকের চক্ষে ভরসা আনয়ন করিলেন—এই একদিন; এইরূপে (দেশের অন্ধীভূত নয়নে কিবা-রাত্র কিবা-দিন!) রাত্রি এবং দিন উল্টিয়া পাল্টিয়া ভয়-আশা এবং আশা-ভয় সঞ্চার করিতে লাগিল। বন্ধন যেমন হইতে হয় তাহাই আমাদের হইয়াছে—কিন্তু তাহাতেও আমাদের আশ মিটিতেছে না; আমরা আরো বন্ধন চাই—আরো বন্ধন চাই! আবার আমরা গাঁয়ে মানুক না মানুক্ আপনি মণ্ডল হইয়া কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের বন্ধন যেখানে একটু আধটু আল্‌গা হইয়াছে দেখিতেছি সেখানে তাহার গিরা শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিতেছি। যদি আমাদিগকে কার্য্য-গতিকে সমুদ্র যাত্রা করিতে হয়, তবে মৃত শাস্ত্রকে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকা

চাই—তাকাইয়া না থাকিলেই নয়—তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য! স্মৃত শাস্ত্র কি আর বলিবে—তাহার পিছনে লুকাইয়া থাকিয়া পাণ্ডারা বলেন "হাঁ সমুদ্র যাত্রা করিতে পার—তবে কি না—" ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি! ইহাঁদের এইরূপ দুই নায়ে পা দেওয়া ভাষাকে—যদি কিন্তু তবে-কিনা প্রভৃতিকে—যাঁহারা অব্যর্থ বেদ-বাক্য মনে করেন, তেমন লোক আজিকের বাজারে খুবই কম;—বাঙ্গালা মুলুকে তো নাই-ই—সমগ্র ভারতবর্ষে আছে কি না সন্দেহ! এসব হ'চ্চে আর কিছু না—ইংরাজিতে যাহাকে বলে Policy! কখনো কখনো যেমন দেখা যায় যে, ডাক্তারের পরামর্শ শুনিয়া মদ্যপায়ী ব্যক্তি মদ ছাড়িয়া আফিম ধরে—অবশেষে মদও চলিতে থাকে, আফিমও চলিতে থাকে;—ইহাঁদের পালিসীও তেমনি! উনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতার কৃত্রিম বন্ধন এড়াইবার মানসে ইহাঁরা শাস্ত্রীয় কৃত্রিম বন্ধনের গিরা শক্ত করিয়া আঁটিবার জন্য বিস্তর আয়াস পাইতেছেন। ইহাতে ফল হইতেছে এই যে, দুই কৃত্রিম বন্ধন পরস্পরের পানে চোক টেপাটিপি করিয়া শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি করিতেছে! শাস্ত্রীয় বন্ধনের পাণ্ডারা বলিতেছেন যে, "আমাদের আশ্রিত অনুগত থাকিয়া আমাদের নিকট হইতে ব্যবস্থা লইয়া বিলাতে যাইতে পার—খানা খাইতে পার—সবই করিতে পার, তাহার জন্য চিন্তা কি!" উনবিংশতীয় বন্ধনের পাণ্ডারা বলেন যে—"গোবরের বটিকা দশ গ্রেণের পরিবর্ত্তে এক গ্রেণ এবং তাহার অনুপান সেরভর সুপ—এইরূপ ব্যবস্থা হইলেই ভাল হয়! তাহাই অনুমতি হোক্।" শাস্ত্রীয় বন্ধনের পাণ্ডারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওরি করিয়া বলেন—"তা সেরূপ ব্যবস্থা আমরা দিতে না পারি এমন নয়—তবে কি না—! যা'ই হোক্—তুমি দুর্ব্বল অধিকারী—তোমার

জন্য—সকলের জন্য নয় শুধু কেবল তোমার জন্য—আমরা তোমার ইচ্ছানুযায়ী ঐরূপ ব্যবস্থা দিতে কোনো হানি বোধ করি না—অতএব তথাস্তু!” এরূপ পলিসী পাড়াগেঁয়ে দলা-দলিতে খুবই কাজে লাগিতে পারে ইহা আমি বিলক্ষণই জানি-তেছি; কিন্তু এটাও তেমনি জানিতেছি যে,—এরূপ পলিসীতে ভারত উদ্ধার করিতে যাওয়া এক আধ ছিলিমের কর্ম্ম নহে! ইহাঁদের পালিসীর আর এক উদ্দেশ্য এই যে, যেখানে বল নাই সেখানে বলের একটা প্রতিমূর্ত্তি খাড়া করিয়া কৌশলে কার্য্যো-দ্ধার! মানিলাম যে, একটি কচি বালককে সোলার সাপে ভয় দেখানো যাইতে পারে, ইহা খুবই সত্য; কিন্তু সেই সত্যের উপরে নির্ভর করিয়া বিস্‌মার্ক বোনাপার্ট এবং প্রভু ক্লাইবের চেলাদিগকে তেমনি করিয়া ভয় দেখাইতে যাওয়া—পালিসীটা কিছু যেন অতিরিক্ত মাত্রা বলিয়া বোধ হয়! পৃথিবীতে যে সময়ে উন্নত বিজ্ঞান দর্শন শিল্প সাহিত্যের জ্ঞানানল-শিখা দিন দিন ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে সমুত্থান করিয়া যোজন যোজন দূরে জ্যোতির্ম্মণ্ডল বিস্ফারিত করিতেছে—সেই সময়ের এই প্রকট দিবালোকে ইঁহারা স্বচ্ছন্দে কতকগুলা জরাজীর্ণ কঙ্কালাবশিষ্ট কৃত্রিম কর্ম্ম-কাণ্ড—যাহার প্রাণ যাহাকে ফেলিয়া পালাইয়া অনেক কাল হইল প্রেতলোকে ঘর বাড়ি ফাঁদিয়া সুখে বসবাস করিতেছে—মর্ত্ত্যে ফিরিয়া আসিবার নামও করে না—সেই শবদেহটাকে বীর পরিচ্ছদে সাজাইয়া তাহাকে জলন্ত সত্যের অভিমুখে ধাক্কা মারিয়া অগ্রসর করিয়া দিতেছেন, এবং আপনারা দশ হাত পিছাইয়া দাঁড়াইয়া—উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন “ভ্যালা মোর বাপ—মুখের এক ফুঁয়ে ঐ আলোটা নিভিয়ে দে—এক ফুঁয়ে!” বুদ্ধদেব এবং তাঁহার পূর্ব্বে উপনিষদ্‌প্রণেতা ঋষিগণ কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের পেষণ-যন্ত্র হইতে

লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য পরাকাষ্ঠা তপস্যা এবং ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু নব্য হিঁদুয়ানির আপনি-মণ্ডল মহোদয়েরা যাঁহারা সংস্কৃত-ভাষার উচ্চারণ পর্য্যন্ত জানেন না, তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রকে দিব্য একটি সরস নারিকেল পাইয়া—তাহার শাঁস কোনো কাজের হইল না—জল কোনো কাজের হইল না—তাহার গাত্র হইতে রাশি রাশি ছোবড়া সংগ্রহ করিতেছেন, আর, তাহারই দড়ি পাকাইয়া দেশের লোকের হাত পা বাঁধিবার কঠিন বন্ধন প্রস্তুত করিতেছেন; এমনি আড়ম্বরের সহিত তাহা করিতেছেন যে, দেখিলে মনে হয়—কত না জানি দেশের উপকার-সাধন হইতেছে— টিকিহীন মস্তকে টিকি গজাইতেছে—ফোঁটাহীন ললাটে ফোঁটা আবির্ভূত হইতেছে—বিলাত-ফের্তারা গোবর খাইয়া তাহার প্রথম অক্ষর দিয়া মুখ-শোধন করিতেছেন—দেশের উপকার ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? ইঁহারা এই এতগুলা ব্যক্তি—আর জন্মিয়াছিলেন রামমোহন রায় একাকী একজন—দোঁহার দুইরূপ বিভিন্ন-শ্রেণীর কার্য্য তুলনা করিয়া দেখিলে কি মনে হয়? মনে হয় যে—অসংখ্য তৃণরাশি স্তূপাকারে সজ্জিত হইলেও তালগাছের মস্তক নাগাল পায় না। যে কারণে প্রাচীন ভারত বুদ্ধদেবকে চিনিল না—ইহুদীরা ঈসাকে চিনিল না—সেই কারণেই বা রামমোহন রায়ের স্মৃতি তাঁহার প্রিয় জন্মভূমিকে ছাড়িয়া ইউরোপ আমেরিকার হৃদয়াভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে! এরূপ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহার বিশ্ব-ব্যাপী মহান্ হৃদয়কে স্বদেশের বিদ্যা-দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা যখন সহস্র বাহু প্রসারণ করিয়াও আঁকড়িয়া পাইলেন না, তখন তাঁহারা আপনাদের অপদার্থতা ঢাকিবার জন্য স্ব স্ব সংকীর্ণ কোটরের মধ্যে প্রবেশ

করিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন "ওটা বিধর্ম্মী—ওকে দূর করিয়া দেও!" এবং সুযোগ পাইলে আজিও আপনি-মণ্ডলের দল ঐ কথার পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনি করিতে ত্রুটি করেন না!

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, অনুরাগ-সোপানে যাঁহারা পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকদিগের নাগাল ছাড়াইয়া বেশী উচ্চ পংক্তিতে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা সেই পশ্চাদ্বর্ত্তী ভ্রাতাদিগকে আপনাদের উচ্চ মঞ্চে উঠাইয়া লইবার জন্য নীচে হাত বাড়াইলে লাঞ্ছনা গঞ্জনার ধুলা কাদা ইঁট পাট্‌কেল তাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ হয়।

অনুরাগ সোপানের যিনিই যত উচ্চ পংক্তিতে অবস্থিতি করুন্ না কেন—একটি নিয়ম কিন্তু সকলেকেই মানিয়া চলিতে হয়; সেটি এই যে, নীচের পঁইটা না মাড়াইয়া উপরের পঁইটায় পদ-নিক্ষেপ করা কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি দেখি যে, একই সময়ে দুই ব্যক্তি যাত্রারম্ভ করিয়াছে অথচ একজন চতুর্থ পংক্তিতে—আর এক জন দ্বিতীয় পংক্তিতে, তবে আমি বলিব যে, প্রথম ব্যক্তির গতির বেগ দ্বিতীয় ব্যক্তির অপেক্ষা দ্বিগুণ; তা বই—এরূপ কথা বলিব না যে, প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঁইটা ডিঙাইয়া এক মুহূর্ত্তে চতুর্থ পঁইটায় উপনীত হইয়াছে। অনুরাগের ক্রমাভিব্যক্তির একটি ধারা-বাহিক প্রকরণ পদ্ধতি আছে—তাহা এই;—

যে কোনো ধাপের অনুরাগ যখনই অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহার নীচের নীচের ধাপের কোনো অনুরাগই মরে না—কেহ বা এক পুরু, কেহ বা দুই পুরু, কেহ বা তিন পুরু, স্তরের নীচে জিয়োনো থাকে এবং জিয়োনো থাকিয়া ভিতরে ভিতরে কার্য্য করে। দেশানুরাগী ব্যক্তির দেশানুরাগের উত্তাপে

তাহার কুলানুরাগ এবং গৃহানুরাগ শুখাইয়া মরে না—বরং পূর্ব্বাপেক্ষা নবতর এবং কল্যাণতর বেশ ধারণ করে। যোদ্ধা বীর যখন যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রিতে সমর-ক্ষেত্রের পার্শ্ববর্ত্তী কোনো একটি চৌকি-পাহারা-স্থানে ঘুমাইয়া বাড়ির স্বপ্ন দেখে, তখন তাহার গৃহানুরাগ কেমন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে! তাহার পর দিন প্রত্যূষে রণ-ভেরীর তীব্র নিনাদে তাঁহার নিদ্রা ভাঙিয়া গিয়া তিনি যখন শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া উঠেন, তখন বটে তাঁহার দেশানুরাগ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া গৃহানুরাগকে পশ্চাতে যাইতে বলে;—কিন্তু তখনও গৃহানুরাগ দেশানুরাগের বক্ষ-প্রাচীরের আড়ালে থাকিয়া বীরের সশস্ত্র বাহুতে মন্ত্রপূত অদৃশ্য তাগা এবং ইষ্ট-কবচ চুপিচুপি বাঁধিয়া দিতে থাকে।

অনুরাগের ক্রমাভিব্যক্তির নিয়ম এই যে, প্রথমে নীচের ধাপের অনুরাগ বিকসিত হয়;—নীচের ধাপের অনুরাগ যখন বিকসিত হয়, তখন উপরের ধাপের অনুরাগ বিকাশোন্মুখ থাকে; তাহার পরে নীচের ধাপের সেই বিকাশ-প্রাপ্ত অনুরাগের মধ্য হইতে সার আকর্ষণ এবং অসার পরিবর্জ্জন করিয়া উপরের ধাপের সেই বিকাশোন্মুখ অনুরাগ ক্রমে ক্রমে বিকসিত হইয়া উঠে। যেমন দেখা যায় যে, মৃত্তিকার রসপান করিয়া বৃক্ষের মূল বর্দ্ধিত হয়, মূলের রস পান করিয়া অঙ্কুর বর্দ্ধিত হয়, অঙ্কুরের রস পান করিয়া শাখা বর্দ্ধিত হয়, শাখার রসপান করিয়া বৃন্ত বর্দ্ধিত হয়, বৃন্তের রস পান করিয়া পত্র পুষ্প ফল বর্দ্ধিত হয়; তেমনি, গৃহানুরাগ প্রাণানুরাগের খাইয়া মানুষ, কুলানুরাগ গৃহানুরাগের খাইয়া মানুষ, দেশানুরাগ কুলানুরাগের খাইয়া মানুষ, সার্ব্বদৈশিক মনুষ্যানুরাগ দেশানুরাগের খাইয়া মানুষ; ঈশ্বরানুরাগ সকলকেই আত্মসাৎ

করিয়া সকলকেই ছাড়াইয়া উঠে। ইহার মধ্যে গুরুতর একটি মন্তব্য কথা এই যে, একদিকে যেমন বৃক্ষের মূল নীচে হইতে উপরে রস-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া বৃক্ষের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপোষণ করে এবং আর একদিকে যেমন পল্লব-পুঞ্জ উপর হইতে আলোক শোষণ করিয়া সেই সঞ্চারিত রস-প্রবাহ পরিশোধন করে; তেমনি, নীচের ধাপের অনুরাগ উপরের ধাপের অনুরাগকে পরিপোষণ করে, উপর-ধাপের অনুরাগ নীচের ধাপের অনুরাগকে পরিশোধন করে। প্রাণানুরাগ গৃহানুরাগকে পরিপোষণ করে, গৃহানুরাগ প্রাণানুরাগকে পরিশোধন করে; গৃহানুরাগ কুলানুরাগকে পরিপোষণ করে, কুলানুরাগ গৃহানুরাগকে পরিশোধন করে; কুলানুরাগ দেশানুরাগকে পরিপোষণ করে, দেশানুরাগ কুলানুরাগকে পরিশোধন করে; সমস্ত অনুরাগ ঈশ্বরানুরাগকে পরিপোষণ করে, ঈশ্বরানুরাগ সমস্ত অনুরাগকে পরিশোধন করে। নীচের ধাপের অনুরাগ উপরের ধাপের অনুরাগ-দ্বারা পরিশোধিত না হইলে তাহা বিষাক্ত হইয়া উঠে; আর, এইরূপ বিষাক্ত অনুরাগকেই আমরা বলি—বিষয়াসক্তি অথবা কাম; পক্ষান্তরে, নীচের ধাপের অনুরাগ যখন উপরের ধাপের অনুরাগ দ্বারা পরিশোধিত হইয়া নির্ব্বিষ হয়, তখন তাহাকেই আমরা বলি প্রেম।

অনুরাগের পরিশোধন বলি কাহাকে? না অনুরাগ হইতে দ্বেষাংশের পরিমার্জ্জন—রক্ত হইতে মলাংশের পরিমার্জ্জন—অমৃত হইতে বিষাংশের পরিমার্জ্জন। ইহার উদাহরণ;—গৃহানুরাগের টান আপনার বাড়ির প্রতি সব-চেয়ে বেশী; তাহার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হইলে নিকট-সম্পর্কীয় জ্ঞাতিদিগের বাড়ির প্রতি বিরাগ এবং বিদ্বেষ তাহার সঙ্গের সঙ্গী হয়; এইরূপে, এ বাড়ির

প্রতি অনুরাগ এবং ও বাড়ির প্রতি বিদ্বেষ দুইই যখন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়, তখন গৃহানুরাগ হইতে সেই দ্বেষাংশের পরিমার্জ্জন অত্যাবশ্যক ;—হইতে পারে তাহা কি উপায়ে ? উপায় আর কিছু না—গৃহানুরাগের জানালা খুলিয়া কুলানুরাগের আলোককে ভিতরে পথ ছাড়িয়া দেওয়া! এ বাড়ি এবং ও বাড়ির মাঝ-খানে মনোমালিন্যের যত কিছু অন্ধকার—সমস্তই কুলানুরাগের আলোকে তিরোহিত হইয়া যায় ; কেন না, কুলানুরাগের চক্ষে এ-বাড়িও যেমন ও-বাড়িও তেমনি। গৃহানুরাগের চুম্বক ইতিবৃত্ত এই ;—প্রথমতঃ, আপনার এবং স্ত্রীপুত্র পরিবারের প্রাণানুরাগ একত্র ঘনীভূত হইয়া গৃহানুরাগের মাটি প্রস্তুত হয় ; দ্বিতীয়তঃ, সেই ঘনীভূত প্রাণানুরাগ হইতে রসাকর্ষণ করিয়া গৃহানুরাগ পরিপোষিত হয় ; তৃতীয়তঃ, কুলানুরাগের আলোক-প্রভাবে গৃহানুরাগ হইতে তাহার দ্বেষাংশ পরিমার্জ্জিত হইয়া গিয়া তাহার রাগাংশ প্রাচুর্ভূত হয়। তাহা যখন হয়, তখন এ-বাড়ি যেমন আপনার, ও-বাড়িও তেমনি আপনার হইয়া দাঁড়ায়। গৃহানুরাগের পৈঁটায় এ যেমন দেখা গেল—কুলানুরাগের পৈঁটাতেও তাই ; আমাদের দেশে হিঁদু মুসলমানের মধ্যে যত কিছু মনোমালিন্যের জ্বর-জ্বালা—দেশানুরাগের আলোক-রশ্মিই তাহার একমাত্র মহৌষধি। কুলানুরাগের আলোক-রশ্মিতে যেমন গৃহানুরাগের দোষ খণ্ডিয়া যায়, দেশানুরাগের আলোকরশ্মিতে তেমনি কুলানুরাগের দোষ খণ্ডিয়া যায় ; এবং ঈশ্বরানুরাগের আলোক-রশ্মিতে সমস্ত অনুরাগেরই দোষ খণ্ডিয়া যায়। এক কথায়—অনুরাগ যতই উচ্চ হইতে উচ্চ পৈঁটায় পদনিক্ষেপ করে, ততই তাহার দ্বেষাংশ কমিয়া আসিতে থাকে এবং রাগাংশ বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি জোড়-মিলানো শব্দ আছে—তাহার মধ্যে রাগ-দ্বেষ একটি। সংসার-ক্ষেত্রে যাঁহাতক রাগ তাঁহাতক দ্বেষ; যাঁহাতক ভালবাসা, তাঁহাতক বিবাদ বিচ্ছেদ মারামারি লাঠালাঠি। আপনার প্রতি এবং আপনার আশ্রিত লোকের প্রতি যেখানেই অনুরাগের বাড়াবাড়ি, অপরাপর ব্যক্তির প্রতি সেইখানেই বিরাগের বাড়াবাড়ি; যেখানে আমি-টি এবং আমারটিই সর্ব্বস্ব, সেখানে অবশিষ্ট জগৎ শত্রুপক্ষেরই সামিল।

আমিটি এবং আমারটির আর সব ভাল কেবল টি-টাই (অর্থাৎ সংকীর্ণ ভাব-টাই) বিষের খনি। অনুরাগের নীচের নীচের পঁইটাতেই ঐ বিষদাঁতটি নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে—উচ্চ উচ্চ পঁইটায় উহার তেজ ক্রমশই নরম পড়িয়া আসিতে থাকে; অনুরাগের সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে ঐ বিষ-দাঁতটি একেবারেই খসিয়া পড়ে। বিষ-দাঁতের আকার প্রকার ভাবভঙ্গীতেই তাহার বিষের অনেকটা কাজ এগোয়;—গৃহানুরাগ বিষ-দাঁত বাহির করিয়া আর কিছু না বলিয়া কেবল-মাত্র যদি বলে "এরা আমার বাড়ির ছেলে মেয়ে, এদের গায়ে হাত তুলিও না" তবে তাহার অর্থই এই যে, আর-কারো বাড়ি বাড়িই নহে! কুলানুরাগ যখন বিষ-দাঁত বাহির করিয়া বলে "আমি ব্রাহ্মণ—নৈকষ্য কুলীন—অমুকের সন্তান!" তখন তাহার অর্থই এই যে, তুমি আমার পায়ের যোগ্য নহ। দেশানুরাগ যখন বিষ-দাঁত বাহির করিয়া বলে "আমি ইংরাজ" তখন তাহার অর্থই এই যে, তুমি নিগর—তা তুমি লোহার আফ্রিকা-দেশেই থাকো আর সোণার ভারতবর্ষেই থাকো তাহাতে কিছুই আইসে যায় না; এইরূপ যেখানে যত পৃথিবীর ভালবাসা তাহারই সঙ্গে বিদ্বেষ এবং অহঙ্কারের বিষ

মিশানো রহিয়াছে; আর, অনুরাগের সঙ্গে এইরূপ অন্ততঃ দু-ফোঁটা এক-ফোঁটা বিষ মিশানো না থাকিলে পৃথিবীর জিহ্বায় তাহা আলুনি আলুনি ঠেকে। তবে, অনুরাগ-সোপানের নীচের নীচের ধাপে বিষের যেমন সাঙ্ঘাতিক প্রকোপ—উপরের উপরের ধাপে তা-অপেক্ষা তাহা মাত্রায় অনেক কম; তা ছাড়া, অনুরাগের সর্ব্বোচ্চ শিখরে বিষের নাম-গন্ধও থাকিতে পারে না।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কোন্ অনুরাগ সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিষ, তবে তাহার এক উত্তর এই যে, ঈশ্বরানুরাগ; তা ভিন্ন—আর আর সমস্ত অনুরাগই জগৎ সংসারকে দুই পক্ষে বিভক্ত করে—আত্মপক্ষ এবং পরপক্ষ। কারো কাছে "আমিটি"ই কেবল আপনার—আর সকলেই পর; কারো কাছে, আমিটি স্ত্রীটি পুত্রটি কন্যাটি ভাইটি ভগ্নিটি পর্য্যন্ত আপনার—তদ্ভিন্ন আর সকলেই পর। কারো কাছে আমিটি হইতে আপনার স্বজাতি পর্য্যন্ত আপনার তাহার ওদিকে সকলেই পর; কারো কাছে আমি-টি হইতে স্বদেশ পর্য্যন্ত আপনার, তাহার ওদিকে সকলেই পর। এই প্রণালীতে লোকে অনুরাগ-সোপানের নীচের নীচের পঁইটা হইতে উপরের উপরের পঁইটায় পদার্পণ করিতে থাকিলে তাহার আত্ম-পক্ষ ক্রমশই বিস্তার লাভ করিতে থাকে—তাহাতে আর ভুল নাই; কিন্তু পক্ষিশাবক যত দিন না মুক্ত আকাশে উড়িতে শেখে, ততদিন তাহার পক্ষ বিস্তারের প্রকৃত সার্থকতা হয় না; তত দিন তাহার উত্থানের সঙ্গে পতন জোড়া লাগানো থাকে;—লোকে যত দিন না ঈশ্বরানুরাগের মুক্ত সমীরণে উত্থান করে, তত দিন তাহার আত্মপক্ষের সঙ্গে একটা না একটা পর-পক্ষ জোড়া লাগানো থাকিতেই চায়; ততদিন হয় এ বাড়ির

দ্বারের সম্মুখে ও বাড়ি—নয় এ জাতির দ্বারের সম্মুখে ও-জাতি, নয় এদেশের দ্বারের সম্মুখে ওদেশ, অষ্টপ্রহর চক্ষু রাঙাইয়া দাঁত মুখ খিঁচাইতে থাকে! কেবল ঈশ্বরানুরাগের পঁইটায় জগৎশুদ্ধ সকলেই আত্ম-পক্ষীয়—সেখানে পর-পক্ষের মূলেই দাঁড়াইবার স্থান নাই; ইহার কারণ এই যে, স্বদেশীয় রাজ্যের বাহিরে যেমন বিদেশীয় রাজ্য—ঈশ্বরের রাজ্যের বাহিরে তাঁহার সেরূপ কোনো প্রতিপক্ষের রাজ্য স্থান পাইতে পারে না; যেহেতু ঈশ্বর আত্মপর সমস্ত ব্যাপিয়া সমস্তেরই মূলে এবং সমস্তেরই অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। এই জন্য ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তির একটি প্রধান পরিচয় লক্ষণ এই যে, ত্রিজগতে কেহই তাঁহার পর নহে; তাহার সাক্ষী চৈতন্য-মহাপ্রভু মুসলমানকে দলে লইতে ডরান্ নাই—রামমোহন রায় বিলাতে যাইতে ডরা'ন নাই—ঈশা জেলে মালা এবং পব্লিকান্ প্রভৃতি ঘৃণিত সম্প্রদায়ের সহিত মেলামেশা করিতে ডরা'ন নাই। কিন্তু হিঁদুয়ানির বড়াই যাঁহাদের ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা পরিচয় লক্ষণ এবং বিজাতির প্রতি বিরাগ যাঁহাদের বৈরাগ্যের চরম-সীমা—তাঁহাদের ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্য ঐ পর্য্যন্ত। ফলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগৎ-সংসারের মধ্য হইতে একটি কোনো ব্যক্তি অথবা একটা কোনো পরিবার বা জাতি বা দেশ বাছিয়া লইয়া তাহাতে বিশেষ রূপে আসক্ত হওয়ার নামই লোকে জানে অনুরাগ-বন্ধন; কিন্তু যে বিশ্বব্যাপী অনুরাগ কাহাকেও না বাছিয়া সকলেরই প্রতি সদ্ভাবের ক্রোড় পাতিয়া দেয়—তাহাকে চক্ষের সমক্ষে বিরাজমান দেখিলেও খুব একজন পাকা জহরী ব্যতীত যে-সে লোকে তাহাকে চিনিতে পারে না;—তাহার মুখের পানে তাকাইয়া লোকে ভাবে যে "এ

আবার কিরূপ অনুরাগ? সকলকে ছাড়িয়া একজনকে ভালবাসার নামই তো আমরা জানি ভালবাসার পরাকাষ্ঠা; সকলকে ভালবাসা আবার কিরূপ? সকলকে ভালবাসা, আর, কাহাকেও ভাল না বাসা, দুইই সমান; এ তো অনুরাগ নহে এ একপ্রকার বিরাগ; একে আমরা বৈরাগ্য বলিতে পারি—অনুরাগ কোনো মতেই বলিতে পারি না!" বাস্তবিক, এই কারণেই ঈশ্বরানুরাগের আর এক নাম হইয়াছে—বৈরাগ্য।

ঈশ্বরানুরাগ তো দূরের কথা—আমাদের দেশের প্রাচীনা গৃহ-পত্নীরা দেশানুরাগকে অনুরাগ বলিয়া কখনই স্বীকার করিবেন না; তাঁহারা অবাক্ হইয়া বলিবেন "ও মা! সোণার স্ত্রী-পুত্র নাতি নাত্নী ফেলিয়া যে লোক যুদ্ধে যাইতে পারে—সে সবই পারে; তাহার প্রাণ পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন—তাহার আবার অনুরাগ!" এইরূপ দেশানুরাগকেই যখন লোক-বিশেষে অনুরাগ বলিতে কুণ্ঠিত হয়, তখন ঈশ্বরানুরাগকে অনুরাগ না বলিয়া বৈরাগ্য বলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর, সাধারণ লোকের মধ্যে যে বস্তুর যে নাম রাষ্ট্র—সমজদার জহরী লোক সেই বস্তুকে সেই নামে নির্দ্দেশ করিতে অগত্যা বাধ্য হ'ন—কেননা, তাঁহারা তাহা না করিলে লোকে তাঁহাদের কথার ভাবই বুঝিতে পারিবে না।

ঈশ্বরানুরাগ কি অর্থে বৈরাগ্য এবং কি অর্থে তাহা অনুরাগের চরমসীমা তাহা এক্ষণে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে;—শুদ্ধ কেবল আমি-টি এবং আমার-টি লইয়া অনুরাগের যে-একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডি তাহার প্রতি বিরাগ—এই অর্থে তাহা বৈরাগ্য; আর, সমস্ত জগতের প্রতি অনুরাগ এবং আনুষঙ্গিকভাবে আমিটি-আমারটির প্রতিও অনুরাগ (কেননা আমিটি

আমারটিও জগতের এক কোণে প্রাণধারণ করিতেছে);—এই অর্থে তাহা অনুরাগের চরম সীমা। অন্তঃকরণে ঈশ্বরানুরাগ উদিত হইলে—সমস্ত জগতের সহিত আমি-টি এবং আমারটির সুর মিলিয়া গিয়া, তাহার ঐ বেসুরা ঝঙ্কারটি—টি-ধ্বনিটি—পাতালে বিলীন হইয়া যায়।

টি-ধ্বনিটি আর কিছু না—বিষয়াসক্তি। বিষয়-শব্দের অর্থই হ'চ্চে—মন যাহাতে ভর দিয়া শয়ন করে—মনের একপ্রকার বালিশ; সাধু-ভাষায় যাহাকে বলে উপাধি। কোনো একটি পরিমিত বিষয়ে মনের আসক্তি বসিয়া গেলে, মনকে সেখান হইতে টানিয়া তোলা দায়; কাজেই, সেই বিষয়-টির সীমার বাহিরে যাহা কিছু অবস্থিতি করে তাহার প্রতি বিরাগ তখন অবশ্যম্ভাবী। বিষয়াসক্তি এইরূপ বিরাগ-মিশ্রিত অনুরাগ; বিদ্বেষ-মিশ্রিত, অহঙ্কার-মিশ্রিত, অনুরাগ; তাই আমরা তাহার নাম দিতেছি বিষাক্ত অনুরাগ। বিষয়াসক্তির আর এক নাম কাম;—এই জন্য ঈশ্বরানুরাগকে আমরা বলি নিষ্কাম অনুরাগ; অথবা যাহা একই কথা—বিশুদ্ধ প্রেম।

অনুরাগ-সোপানের যত উচ্চে ওঠা যায়, ততই অনুরাগের বিষের ভাগ কম পড়িয়া আসে; তাহার প্রমাণ এই যে, আদুরে ছেলের মায়ের বিষ অপেক্ষা, পাড়াগেঁয়ে কুলীন-সম্প্রদায়ের বিষ মাত্রায় কম; কুলীনের কুলোপানা চক্রের ফোঁস-ফোঁসানি অপেক্ষা মানোয়ারি গোরার মুখের বিষ অনেক কম; হদ্দ ড্যাম্ নিগর-টা আস্‌টা—তার বেশী নয়! তাও আবার—অর্দ্ধেক মুখে, অর্দ্ধেক পেটে! পিতৃ-মাতৃ উচ্চারণ পূর্ব্বক পাড়া সরগরম করা কুলীনসন্তানদিগেরই একচেটে পৈতৃক সম্পত্তি। এটা সত্য যে, কুলীনের মুখের অস্ফালন ফাঁকা আওয়াজ বই নয়—

গোরা-লোকের বাল্যক্রীড়া কালা-লোকের মৃত্যু! কিন্তু হইলে হইবে কি—এটাও তেমনি দেখিতেছি যে, ষাঁড়ের শৃঙ্গের আঘাতে মানুষ মারা পড়ে, কেটো পিঁপড়ের কামড়ে কাহারো বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না; অথচ বিষাক্ত বলিতে আমরা কেটো পিঁপড়ের কামড়কেই বিষাক্ত বলি—শৃঙ্গের আঘাতকে নহে। অধিক কি আর বলিব, দেশানুরাগের গালাগালিও দেশ-ঘটিত, কুলানুরাগের গালাগালিও কুল-ঘটিত! কুলানুরাগীর প্রধান গালাগালি হ'চ্চে বাপান্ত—দেশানুরাগীর প্রধান গালাগালি হ'চ্চে দেশান্ত—যেমন ড্যাম নিগর প্রভৃতি সাদরসম্ভাষণ! এখন জিজ্ঞাসা করি—বিষ বেশী কার? বাপান্তের না দেশান্তের? অতএব এটা স্থির যে, অনুরাগ যত উচ্চ হইতে উচ্চে পদার্পণ করে, ততই তার বিষ নরম পড়িয়া আসিতে থাকে; আর, যতই তাহা সংকীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণ কোটরে প্রবেশ করিতে থাকে ততই তার বিষ-দাঁত গজাইয়া উঠিতে থাকে।

নিষ্কাম কর্ম্ম আর কিছু না—নির্ব্বিষ অনুরাগ যাহার মূল প্রবর্ত্তক তাহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম; আর, বিষাক্ত অনুরাগ যাহার মূল প্রবর্ত্তক তাহারই নাম সকাম কর্ম্ম। দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি যদি প্রধানতঃ আপনার উদর পূরণের জন্য কার্য্য করে, আর এক ব্যক্তি যদি প্রধানতঃ স্ত্রীপুত্র-পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য কার্য্য করে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য্য প্রথম ব্যক্তির কার্য্য অপেক্ষা বেশী নিষ্কাম তাহাতে আর কাহারো সংশয় হইতে পারে না। অতএব ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না যে, অনুরাগ-সোপানের যিনি যত উচ্চ পৈঁটায় অবস্থিতি করেন, তাঁহার কার্য্য সেই পরিমাণে

নিষ্কাম পদবীতে সমুত্থান করে। তবেই হইতেছে যে, ঈশ্বরানুরাগ যে-কর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক তাহাই সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম শব্দের বাচ্য।

অতঃপর প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সাধনের মধ্যে ভেদাভেদ কিরূপ তাহা বলিবামাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে। যথা;—

কুলানুরাগের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম মনুষ্যের পক্ষে যতদূর সম্ভব-পর, আমাদের দেশে গৃহী ব্যক্তিদিগের সাধনার দৌড় সেই পর্য্যন্ত। আর দেশানুরাগের বিশাল পরিধির মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম মনুষ্যের পক্ষে যতদূর সম্ভব-পর, প্রতীচ্য দেশে সাধনার দৌড় সেই পর্য্যন্ত। সংক্ষেপে,—প্রতীচ্য ভূখণ্ডে দেশানুরাগ, এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডে কুলানুরাগ, হিতানুষ্ঠানের মূল প্রবর্ত্তক।

এ কথা আমি অস্বীকার করি না যে, এক্ষণে আমাদের দেশের কৃতবিদ্য লোকদিগের মনে অল্প অল্প করিয়া দেশানুরাগের অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা গতিকে কুলানুরাগের পরাক্রম দিন দিন খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া চারিদিক্ হইতে মুহুর্মুহু এইরূপ একটা ক্রন্দনের রোল উঠিতেছে যে "সব গেল, সব গেল কিছুই আর থাকে না!" কাঁদুনি-গায়কদিগের জানা উচিত যে, এক রাজার মৃত্যু হইলে আর-এক রাজা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'ন, ততক্ষণ দেশের আরাজক অবস্থা অনিবার্য্য; কিন্তু তাহা বলিয়া কে এমন নির্ব্বোধ যে, সেই অরাজক অবস্থার প্রতিনিধান-মানসে মৃতরাজাকে চিতা হইতে উঠাইয়া আনিয়া পুনরায় তাঁহাকে ঠেকো দিয়া সিংহাসনে বসাইয়া রাখে। কুলানুরাগ এবং দেশানুরাগ দুয়ের মাঝখানে

অরাজকতার মুলুক ইহা আমরা বিলক্ষণই দেখিতেছি, কিন্তু তার সঙ্গে এটাও দেখিতেছি যে, নবাঙ্কুরিত দেশানুরাগকে দাবিয়া রাখিয়া কুলানুরাগকে সিংহাসনে বসাইতে যাওয়া বৃথা পণ্ডশ্রম। দেশানুরাগ যদি কুলানুরাগের নীচের পঁইটা হইত, তাহা হইলেই উপদেষ্টার মুখে এই কথা শোভা পাইত যে, "হে ভ্রাতৃগণ দেশানুরাগের স্কন্ধে ভর করিয়া কুলানুরাগের মঞ্চে উত্থান কর!" কিন্তু বাস্তবিক তো আর তাহা নহে—কুলানুরাগ তো দেশানুরাগের উপরের পঁইটা নহে—দেশানুরাগই কুলানুরাগের উপরের পঁইটা; কাজেই উপদেষ্টার মুখে উল্টা আরো এই কথাই শোভা পায় যে, "কুলানুরাগের স্কন্ধে ভর করিয়া দেশানুরাগের মঞ্চে উত্থান কর।"

কিন্তু আমাদের দেশে দেশানুরাগের বড়ই এক্ষণে দুর্গতি। এক্ষণে আমাদের দেশের বালকেরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া অবধি পোনেরো ষোলো বৎসর ধরিয়া কুলানুরাগ ডিঙাইয়া দেশানুরাগের ইতিবৃত্ত সকল প্রবল অধ্যবসায়ের সহিত গলাধঃকরণ করিতে থাকে; অথচ দেশানুরাগ যে কি পদার্থ তাহা তাহাদের হৃদয়ে পৌঁছে না—কেবল মস্তিকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে একটা গোলযোগ বাধাইয়া তোলে। দেশীয় দলপতিদিগের কুলানুরাগের আবরণের মধ্যে তাহারা স্বার্থের মায়াবী রাক্ষসমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছে এবং ঐতিহাসিক মাহাত্মাদিগের দেশানুরাগের যশোরশ্মির অভ্যন্তরে তাহারা নিঃস্বার্থ মহত্বের দেবমূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছে—আর এখন তাহাদিগকে ধরিয়া রাখা দায়! কিন্তু হইলে হইবে কি—দেশানুরাগের পথঘাট সমস্তই তাহাদের নিকটে অপরিচিত; কুলানুরাগের হস্তাবলম্বন ছাড়িয়া—যেমন তাহারা দেশানুরাগের পঁইটায় পা দিবার উপক্রম

করিতেছে—আর অমনি তাহাদের পা পিছলিয়া তাহারা নীচের ধাপে নামিয়া পড়িতেছে; কুলানুরাগ হইতে তাহারা উঠিবে কোথায় দেশানুরাগে—নামিয়া পড়িতেছে গৃহানুরাগে! ইহা দেখিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন সম্প্রদায়েরা এই বলিয়া মুহুর্মুহু বিলাপ করেন যে, এখনকার লোকে কেবল আপনি এবং আপনার পরিবার বোঝে।

আসল কথা এই যে, দেশানুরাগকে আমরা যে, হাত বাড়াইলেই মুঠার মধ্যে পাইব এরূপ একণে প্রত্যাশা করাই অন্যায়। ইউরোপে কুলানুরাগের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া তবে দেশানুরাগ জয়ী হইতে পারিয়াছে। ইউরোপের তামসিক মধ্যম অব্দে রাজ-বংশীয় লোকেরা কুলের পক্ষ হইয়া এবং অপর সাধারণ লোকেরা দেশের পক্ষ হইয়া আপনাদের মধ্যে কত না রক্তারক্তি করিয়াছে! এইরূপ অনেক বর্ষের অনেক রক্তারক্তির পর দেশানুরাগ চরমে জয় লাভ করাতে তাহারই গুণে ইউরোপ একণে ইউরোপ হইয়াছে। আমাদের দেশে ঠিক তাহার বিপরীত;—আমাদের দেশে কুলানুরাগই দেশানুরাগের উপরে জয় লাভ করিল; ব্রাহ্মণদিগের পাকচক্রে বুদ্ধের সমস্ত সংকল্প তাঁহার জন্মভূমিতে নিষ্ফল হইল; সাধারণ প্রজামণ্ডলীর উপরে কুলীনদিগের কুলমর্য্যাদা সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইল; সনাতন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম অরণ্যে প্রস্থান করিল; এবং লোকসমাজে কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের যজন যাজন একাধিপত্য করিতে লাগিল!

কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি;—অতীতকালে যাহা ছিল তাহা ছিল—যাহা হইয়াছে তাহা হইয়াছে—তাহার জন্য ভাবিয়া কোনো ফল নাই। বর্ত্তমানকালে আমাদের আছেই বা কি আর, আমাদের করিতে হইবেই বা কি, তাহাই একণে বিবেচ্য

আমাদের আছে যাহা, তাহা ভরপুরই আছে; নাই যাহা, তাহা মূলেই নাই; আছে কি? না কুলানুরাগ; নাই কি? না দেশানুরাগ।

এক্ষণে আমরা, করিব তবে, কি? আমরা কি দেশানুরাগের মায়া-মৃগ অনুসরণ করিয়া সারা হইব? তাহা যদি করি—তবে কুলানুরাগের সীতা হারানো এবং সেই সঙ্গে একূল ওকূল দুকূল হারানো—আমাদের ললাটে অবশ্যম্ভাবী। অকর্ম্মণ্য কুলানুরাগ যদিচ আমাদের দেশের একপ্রকার জর-বিকার, কিন্তু জর ছাড়িলেই নাড়ি ছাড়িবে—এইটি জানিয়া—বুঝিয়া সুঝিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশ হইতে উচ্চবংশীয় লোকের জাতীয় গৌরব সমূলে উচ্ছিন্ন হইলে—যাহা আমাদের ছিল তাহাও যাইবে, যাহা আমাদের চাই তাহাও পাইব না;—তাহা হইলে আমাদের পৌত্রানুপৌত্রেরা এই বলিয়া আমাদিগকে উপহাস করিবে যে, ছিলেন মানুষ, হইতে গেলেন দেবতা, হইয়া পড়িলেন মানুষের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ!

তবে কি আমরা কুলানুরাগকেই সর্ব্বস্ব করিব?—তাহা যদি করি—তাহা হইলে প্রবল কাল-স্রোতের উজানে আমাদের সমাজের গতি হইবে—জ্ঞানের আলোক নিভিয়া যাইবে—মোহান্ধ কুল-গরিমা নৌকার হাল ধরিয়া মাঝি হইয়া বসিবে; সেই অন্ধ আনাড়ির হাতে আমরা যদি ধন প্রাণ সঁপিয়া দিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকি—তবে নৌকা-ডুবি অনিবার্য্য।

আমাদের দেশ এক্ষণে দ্বেষ-হিংসার তরঙ্গে দোদুল্যমান ভীষণ সমুদ্র; তাহা হইতে ভয়ে চক্ষু ফিরাইয়া কুলকেই আমরা মনে করিতেছি নিরাপদ কূল;—দূর হইতে আমাদের এইরূপ মনে হয় বটে—কিন্তু কাছে গিয়া দেখিলেই দেখিতে পাই যে,

কূল সে অতি ভয়ানক স্থান—নিবিড় অন্ধকার সেখানে নির্ভয়ে বসতি করিতেছে—তাহা ব্যাঘ্র ভল্লুক এবং সর্পের বহুকেলে আশ্রয়-দুর্গ।

বাস্তবিক, কুলানুরাগ দেশানুরাগের নীচের পঁইটা বই উপরের পঁইটা নহে।

ইউরোপীয়েরা দেশানুরাগের উত্তেজনায় কেমন অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব মহৎ মহৎ কার্য্য সাধন করে এবং কেমন অবলীলা-ক্রমে তাহা করে—তাহা আমরা প্রত্যহই চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছি; কিন্তু কুলানুরাগের উত্তেজনায় আমরা কি করি? করিবার মধ্যে করি কেবল—গাঁয়ে মানে না আপনি-মণ্ডল হইয়া হিঁদুয়ানির প্রচার, অথবা যাহা একই কথা—হিঁদুয়ানির শ্রাদ্ধ! কখনো বা আমরা বন-গাঁয়ে শেয়াল রাজা হই—তখন আমাদের প্রতাপ দেখে কে?—এ'কে জাতে তুলিতেছি—ও'কে জাত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছি—এ'র নিমন্ত্রণ বন্ধ করিতেছি—ওকে সমাজে চালাইয়া লইতেছি—এইরূপ গুরুতর রাজকার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া (মহাবীর ডন্‌কুইক্‌সোট্ আমাদের কাছে কোথায় লাগে!) আমরা আপনা-আপনাকে সিংহ শার্দ্দূল অপেক্ষাও বড় মনে করিতেছি। কুলানুরাগ হইতে আমাদের দেশে কার্য্য বড় জোর এই যা সম্ভবে—এ ছাড়া আর কিছুই সম্ভবে না।

যদি বল "দেশানুরাগ!" তবে তাহার এখনো ঢের বাকি—আমাদের দেশে তাহার গোড়াপত্তনও হয় নাই। দুঃখের কথা কি বলিব—আমাদের স্বদেশানুরাগও আমাদের স্বদেশীয় সামগ্রী নহে! বিলাতি ধুতির ন্যায় আমাদের বিলাতি স্বদেশানুরাগ ইংরাজি দোকানে খুব সস্তাদরে বিক্রীত হইতেছে—টাকাটা

সিকেটা খরচ করিলেই তাহা পাওয়া যাইতে পারে;—টাকাটা সিকেটা এখানে আর কিছু না—বামণ-কায়েতের কুল-মর্য্যাদা—যাহার বিনিময়ে আমাদের দেশের আপামর সাধারণ যে সে লোক মনে করিলেই "পেট্রিয়ট" নাম ক্রয় করিতে পারে। এরূপ দেশানুরাগ জিনিস্ খুব সস্তা বটে কিন্তু তাহার বিস্‌মোল্লায় গলদ্! বিদেশীয় ঢঙের স্বদেশানুরাগ, আর, সোণার পাথরবাটি, দুয়ের মধ্যে তিল-মাত্রও প্রভেদ নাই।

এই বিষম সংকটে আমাদের উদ্ধারের পথ একটি কেবল আছে—সেটি আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না; সেটি পলিসীর পথ নহে কিন্তু সত্যের পথ—ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্যের পথ! এইস্থলে আমি বিনীতভাবে শ্রোতৃবর্গের নিকট হইতে এই একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা চাই—যেন ভগবদ্ভক্তি বলিতে তাঁহারা কেহ প্রতিমা-পূজা অথবা মানুষ-পূজা না বোঝেন, আর, বৈরাগ্য বলিতে বনে যাওয়া অথবা কাজের বা'র হইয়া যাওয়া না বোঝেন। উপনিষদের বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান অবলম্বন করিয়া ভগবদ্গীতার প্রণেতা যেরূপ ভগবদ্ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন তাহাকেই এখানে আমি বলিতেছি ভগবদ্ভক্তি; আর, তিনি যেরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন তাহাকেই এখানে আমি বলিতেছি বৈরাগ্য।

দেশানুরাগের কথা ছাড়িয়া দেও—তাহা আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে জন্মিবারই অবকাশ পায় নাই; এক্ষণে আমাদের দেশে গৃহী ব্যক্তির যত কিছু সংসার-ধর্ম্ম, কুলানুরাগই তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রবর্ত্তক; তা বই, বৈরাগ্য আমাদের দেশে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রবর্ত্তক না হইয়া নিশ্চেষ্টতার প্রবর্ত্তক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈরাগ্যের বাগ ফিরাইয়া তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্মের

সাধনায় নিযুক্ত করা সকল কাজের শেরা কাজ—এই কাজটি এখনো আমাদের আপনাদের হাতে রহিয়াছে।

কুলানুরাগ এ পক্ষের নির্ভরস্থল, দেশানুরাগ ও-পক্ষের নির্ভরস্থল; বৈরাগ্য অনুভয় পক্ষের নির্ভর-স্থল। বৈরাগ্যের মুক্ত সমীরণ ক্ষণকালের জন্যও যদি আমরা সেবন করি, তবে আমরা বাহিরে পরাধীন হইলেও অন্তরে স্বাধীন হই;—সে সমীরণের প্রত্যেক হিল্লোলে আমাদের ধড়ে প্রাণ আসে—তাহা মৃত-সঞ্জীবনী সুধা। সেই সুধা-সিঞ্চনে প্রাণ পাইলে মনুষ্য না করিতে পারে এমন অসাধ্য কাজই নাই। দেশানুরাগী ব্যক্তি কামান বন্দুক দিয়া বিদেশ জয় করে—এই পর্য্যন্ত;—ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি হৃদয়ের অনুরাগ দিয়া পৃথিবী জয় করেন! ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি যখন অনুভয় পক্ষের মুক্ত সমীরণ হইতে উভয়-পক্ষের মধ্য-স্থলে অবতীর্ণ হইয়া সকল-পক্ষেরই মঙ্গল কামনা করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হ'ন, তখন কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। এইরূপ উচ্চ অঙ্গের নিষ্কাম-সাধনা কাহাকে বলে তাহা যদি কার্য্যে মূর্ত্তিমান্ দেখিতে চাও, তবে রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ কর। উভয়-পক্ষের মধ্যস্থলে দণ্ডায়-মান হইয়া কেমন করিয়া বিদ্বেষকে অনুরাগ-দ্বারা জয় করিতে হয়—অসত্যকে সত্য দ্বারা জয় করিতে হয়—পরকে আপনার করিতে হয়, স্বদেশীয় গুণের উচ্ছ্বাস দ্বারা বিদেশকে বশীভূত করিতে হয়—তাঁহার জীবনচরিতের প্রত্যেক পত্র এবং প্রত্যেক ছত্র তোমাকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিবে। ইংলণ্ডে তাঁহার সমাধি-মন্দির দেখিয়া ভয় পাইও না; যতদিন সেখানে তিনি বাঁচিয়াছিলেন ততদিন তাঁহার মন তাঁহাকে লইয়া স্বদেশে পড়িয়া রহিয়াছিল; ততদিন—তাঁহার গাত্রে স্বদেশীয় পরিচ্ছদ

এবং কণ্ঠে স্বজাতীয় উপবীত, দুয়ে মিলিয়া সাক্ষ্য দান করিয়াছে যে, তিনি স্বদেশকেও বিস্মৃত হ'ন নাই—স্বজাতিকেও বিস্মৃত হ'ন নাই; অথচ তিনি স্বদেশ বিদেশ স্বজাতি বিজাতি সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্যের কৈলাশ-শিখরে দেবতাগণের সহিত একত্রে ব্রহ্মগান করিতেছিলেন; তাহার সাক্ষী—সমুদ্রের মাঝখানে "কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি, তোমারি রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি; দেশ-ভেদে কাল-ভেদে রচনা অসীমা, প্রতিক্ষণে সাক্ষ্যদেয় তোমার মহিমা; তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।" এ গীত তাঁহারই হস্ত দিয়া এবং তাঁহারই কণ্ঠ দিয়া বাহির হইয়াছিল*। ব্রাহ্মণ জাতির প্রধানধর্ম্ম যে অধ্যয়ন অধ্যাপন দেবারাধনা এবং পরোপকার, তাহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। তিনি এ দেশ এবং একাল দুয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কেমন করিয়া যে

---

* যাঁহারা পালিসী-সূত্রে উপবীত ধারণ করেন তাঁহারা স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক: রামমোহন রায় সে দরের লোক ছিলেন না—ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। রামমোহন রায় অবশ্য এটা জানিতেন যে, উপবীত রাখিলেও স্বর্গ-লাভ হয় না, উপবীত ফেলিয়া দিলেও জাত যায় না। বিজ্ঞানের একটি সিদ্ধান্ত এই যে, কোনো একটি গতিশীল ব্যাপার নীচের পঁইটা ছাড়াইয়া উপরের পৈঁটায় উঠিলে নীচের পঁইটার কতক-গুলি অবয়বের ছাপ তাহার গায়ে লাগিয়া থাকে—যদিচ বর্ত্তমান পৈঁটায় তাহা খাদবেই কোনো কাজে লাগে না; বিজ্ঞান-শাস্ত্রে ইহাকে বলে atavism। সর্প—টিকটিকির জাত; তাহার আদিম পূর্ব্ব পুরুষদিগের পা ছিল এরূপ অনুমান হয়; কিন্তু এখন সর্প বিনা পায়ে চলিতে পারে—সুতরাং এখন তাহার পা থাকিলেও যা, না থাকিলেও তা; না থাকিলে বরং তাহার শরীর হাল্কা হয়; কিন্তু তথাপি পূর্ব্বকালের স্মারক চিহ্ন-রূপে সর্প-শরীরের যথাস্থানে পদ-দ্বয়ের অঙ্কুর এখনো পর্য্যন্ত খোলস-ঢাকা রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। রামমোহন রায় যদিচ কুলানুরাগের পৈইটা ছাড়াইয়া অনেক উচ্চে উঠিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার কুল-মাহাত্ম্যের একটি স্মারক-চিহ্ন তাঁহাকে দংশিয়া ধরিয়াছিল—কেবল স্বভাবের প্রভাবে; তা বই—তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা কিছুই ছিলনা—পালিসী কিছুই ছিল না।

চকিতের মধ্যে দুই পক্ষের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন—দেখিয়া মনে হয় ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার; তাহা বলিয়া তাহা কৃত্রিম পলিসীর কোনো ধার ধারে না; তাহা অকৃত্রিম অনুরাগের স্বভাব-সুলভ কার্য্য-নৈপুণ্য। তাহা প্রতিভার কন্যা—প্রত্যুৎপন্ন-মতি! দুর্ব্বুদ্ধির কন্যা আত্মঘাতিনী পালিসী, সেই স্বর্গীয় দেব-কন্যাটির মতো সাজ-গোজ করিয়া অনভিজ্ঞ লোকের চক্ষে ধূলা দিতে পারে—কিন্তু তাহার মুখাবরণের ভিতরে একটু উঁকি দিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম—দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। পালিসীবেত্তারা সকলেই বুঝিতেছেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে, খোট্টা-বাঙ্গালির মধ্যে এবং আর আর সহোদর জাতিগণের মধ্যে দলাদলির হাঙ্গামা কোনো মতে চুকিয়া যাইতে পারিলেই ভারতভূমির হাড়ে বাতাস লাগে; কিন্তু কেমন করিয়া যে, তাহা হইতে পারে তাহা কেহই বুঝিতেছেন না; একা কেবল রামমোহন রায়ই তাহা বুঝিয়াছিলেন—তিনি তাঁহার দূরদর্শী প্রজ্ঞা-নয়নে স্পষ্টাকারে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, একেশ্বর-বাদের জয়-ধ্বজার অধীনেই হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালি খোট্টা শিক প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিরা এক মা-বাপের সন্তান হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারে; মাতা—ভারতভূমি! পিতা স্বয়ম্ভূ ভগবান! ইউরোপীয় জাতিদিগের যত কিছু মহত্তর সাধনা সমস্তই প্রধানতঃ দেশানুরাগেরই উত্তেজনা; রামমোহন রায় দেশানুরাগ হইতে আর এক ধাপ উচ্চে উঠিয়া বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি এবং নিষ্কাম সাধনার পথ আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়া চকিতের মধ্যে অন্তর্ধান করিলেন! তাঁহার কাজ ফুরাইল—আর তাঁহাকে কে ধরিয়া রাখিতে পারে? এমন একজন মনুষ্য সে দিন আমাদের দেশে জন্ম-

গ্রহণ করিলেন, তবুও আমরা তাঁহাকে ঘুণাক্ষরেও চিনিতে পারিলাম না—তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এক ফোঁটাও অশ্রু বর্ষণ করিলাম না—অথচ আমরা "হায় সেকাল হায় সেকাল" করিয়া বুক চাপড়াইয়া রাস্তার মাঝখানে নূতন একতরো হাসেন হোসেন্‌কে আসরে নামাইতেছি—ইহাতে হাসিব কি কাঁদিব ঠিক্ করিয়া ওঠা দায়! হাসেন-হোসেনের নাট্যাভিনয় যথেষ্ট হইয়াছে এক্ষণে সাধনায় প্রবৃত্ত হও। রামমোহন রায় যে-পথে নিশান ধরিয়া সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইয়া আছেন সেই পথের অনুযাত্রী হও। ফাল্‌তো মায়া-কান্না মায়া-ভক্তি এবং মায়া-চাতুরী ছাড়ো—পালিসী ছাড়ো! সাহসে ভর করিয়া এপক্ষ এবং ও পক্ষের মধ্যস্থলে, এদেশ এবং একালের মধ্যস্থলে, দণ্ডায়মান হও; সেই বিবাদী ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া সত্য দ্বারা অসত্যকে জয় কর—অনুরাগ দ্বারা বিদ্বেষকে জয় কর—মঙ্গল দ্বারা অমঙ্গলকে জয় কর—এইরূপ কর যে, দেশের তাহাতে মঙ্গল হইবে—কুলের তাহাতে মঙ্গল হইবে— পৃথিবীর তাহাতে মঙ্গল হইবে!

শৈশব সন্ধ্যা।

দুই ধারে চষা মাটি; মাঝে আঁকাবাঁকা
চলিয়াছে পথখানি পায়ে পায়ে আঁকা
গ্রামের কিনারে; ধূ ধূ করিতেছে মাঠ
সন্ধ্যালোকে জনহীন; ভেঙ্গে গেছে হাট,
ফিরে গেছে যে যাহার ঘরে; খেয়া ঘাটে,
খেয়া নাই, বাঁধা নৌকা, মাঝি নাই পাটে।

নদীতীরে আম্রবন, তারি এক পাশে
সূর্য্য অস্ত যায়, কনক কিরণোচ্ছ্বাসে
চমক লাগায়ে দিয়ে আঁধারের চোখে।
শান্ত স্থির নদীজল, সন্ধ্যার আলোকে।
পড়ে' আছে যেন এক সোনার মুকুর।
পরপারে বালুচর বহু—বহু দূর।

শরিষার ক্ষেতভরা ফুটিয়াছে ফুল
পুকুরের এক পাড়ে; বাতাস আকুল
থেকে থেকে গন্ধ তার উড়াইয়া আনে
বহু বয়সের কথা জাগায়ে পরাণে।

কোন খানে শব্দ নাই, শুধু নদীপারে
মাঝে মাঝে উর্দ্ধশ্বাসে কে ডাকিছে কারে
পরপার লক্ষ্য করি,'—বালুচর ঘুরে'
স্তব্ধ নদী পার হয়ে, ম্রিয়মান সুরে
হতাশ্বাস প্রতিধ্বনি একা ফিরে আসে;
শুনি' সকরুণ ডাক পরাণ উদাসে।

ধীরে ধীরে বিস্তারিছে ঘেরি চারিধার
শ্রান্তি, আর শান্তি, আর সন্ধ্যা-অন্ধকার,
মায়ের অঞ্চলসম। দাঁড়ায়ে একাকী
মেলিয়া পশ্চিম পানে অনিমেষ আঁখি
স্তব্ধ চেয়ে আছি; আপনারে মগ্ন করি'
অতলের তলে, ধীরে লইতেছি ভরি'

জীবনের মাঝে—আজিকার এই ছবি,
জনশূন্য নদীতীর, অস্তমান রবি,
ম্লান মূর্চ্ছাতুর আলো—রোদন-অরুণ
ক্লান্ত নয়নের যেন দৃষ্টি সকরুণ
স্থির বাক্যহীন,—এই গভীর বিষাদ,
জলে স্থলে চরাচরে শ্রান্তি অবসাদ।

সহসা উঠিল গাহি' কোন্‌খান্ হতে
বন-অন্ধকার ঘন কোন্ গ্রামপথে
যেতে যেতে গৃহমুখী বালকপথিক।
উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর নিশ্চিন্ত নির্ভীক
কাঁপিছে সপ্তম স্বরে; তীব্র উচ্চতান
সন্ধ্যারে কাটিয়া যেন করিবে দু'খান।

দেখিতে না পাই তারে; ওই যে সম্মুখে
প্রান্তরের সর্ব্ব প্রান্তে, দক্ষিণের মুখে,
আখের ক্ষেতের পারে, কদলি সুপারি
নিবিড় বাঁশের বন, মাঝখানে তারি
বিশ্রাম করিছে গ্রাম,—হোথা আঁখি ধায়।
হোথা কোন্ গৃহপানে গেয়ে চলে' যায়
কোন্ রাখালের ছেলে, নাহি ভাবে কিছু,
নাহি চায় শূন্যপানে, নাহি আগুপিছু।

দেখে শুনে মনে পড়ে সেই সন্ধেবেলা
শৈশবের; কত গল্প, কত বাল্যখেলা,

এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন;
সে কি আজিকার কথা, হল কত দিন!
এখনো কি বৃদ্ধ হয়ে যায়নি সংসার!
ভোলে নাহি খেলাধূলা, নয়নে তাহার
আসে নাই নিদ্রাবেশ শান্ত সুশীতল,
বাল্যের খেলানাগুলি করিয়া বদল
পায় নি কঠিন জ্ঞান! দাঁড়ায়ে হেথায়

নির্জ্জন মাঠের মাঝে, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,
শুনিয়া কাহার গান পড়ি' গেল মনে
কত শত নদীতীরে, কত আম্রবনে,
কাংস্যঘণ্টামুখরিত মন্দিরের ধারে,
কত শস্যক্ষেত্র প্রান্তে, পুকুরের পাড়ে
গৃহে গৃহে জাগিতেছে নব হাসিমুখ,
নবীন হৃদয়ভরা নব নব সুখ,
কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব্ব কল্পনা,
কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা,

অনন্ত বিশ্বাস। দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক,
সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক।

আকাশ-তরঙ্গ।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আকাশতরঙ্গ ঘটিত কয়েকটি নূতন আবিষ্কার পাঠকের নিকট উপস্থিত করিব। বিশ বৎসর হইল

মহামতি ক্লার্ক্ ম্যাক্স্‌বেল জ্ঞানচক্ষে জড়জগতের এই অদ্ভুত রহস্য দেখিয়া যান। তিন বৎসর হইল জর্ম্মনি দেশের হার্টজ সাহেব তাহা আমাদের চর্ম্মচক্ষের গোচর করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে জাগতিক ক্রিয়াপ্রণালীর অনেক তথ্য বাহির হইয়াছে; কিন্তু এত বড় তথ্য বুঝি আর বাহির হয় নাই। পরিতাপ যে, মাক্সবেল আজ বাঁচিয়া নাই!

আলোক বুঝিতে গিয়া ঈথর নামক বিশ্বব্যাপী পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতের 'আকাশ' নামে একটা সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন; পদার্থটা তাঁহাদের মতে বিশ্বব্যাপীও ছিল। সুতরাং ঈথর শব্দের বাঙ্গলায় আমরা আকাশ বসাইতে পারি। তবে সেকালের আকাশ একটা কল্পনাপ্রসূত দ্রব্য; আর একালের আকাশের অস্তিত্বে বড় একটা সন্দেহ নাই। অন্ততঃ প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘর বাড়ী হাতী ঘোড়া গাছ পালা যে অর্থে অস্তি, এই আকাশ প্রত্যক্ষ না হইলেও সেই অর্থে অস্তি। নাস্তি বলিবার বড় উপায় নাই। তবে আকাশের সকল গুণাগুণ আমরা এখনও জানিতে পারি নাই; কিন্তু কোন্ পদার্থেরই বা সকল গুণাগুণ আমরা অবগত আছি?

এই আকাশের এ কটা গুণ এই যে,ইহা নাই এমন জায়গা নাই। শূন্য স্থলে ত আছেই তা ছাড়া জল বায়ু সোণা রূপা মাটী পাথর সকল জড় পদার্থেরই অভ্যন্তরে 'ওতপ্রোত ভাবে' জড়িত আছে। ইহার আর একটা গুণ এই যে, ইহার কোন অংশ কোন রকমে একটু নাড়িয়া দিতে পারিলে তখনি চারিদিকে ঢেউ উঠিয়া দিগন্তে বিস্তীর্ণ হয়। জল নাড়িয়া দিলে যেমন জলাশয়ের পৃষ্ঠে ঢেউ উঠিয়া প্রসারিত হয়, তার নাড়িয়া দিলে যেমন চারিদিকের

বাতাসে ঢেউ উঠিয়া প্রসারিত হয় ও শ্রুতিমধ্যে উপনীত হইলে শব্দজ্ঞান উৎপন্ন করে, তেমনি এই আকাশকে কোন রকমে নাড়িয়া দিলে ঢেউএর পর ঢেউ উঠিয়া সুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে থাকে। তার বেগই বা আবার কত! এখানে ঢেউ আরম্ভ হইলে সেকণ্ড মধ্যে প্রায় লক্ষ ক্রোশ দূরে যাইয়া সেই ঢেউগুলির ধাক্কা লাগিবে। সূর্য্যমণ্ডল যে এতদূরে আছে—প্রায় সাড়ে চারি কোটি ক্রোশ দূরে আছে—সেখানে সেই ঢেউ উঠিবা মাত্র আটমিনিট মধ্যে আমাদের চোখে আসিয়া তাহার ধাক্কা লাগে। চোখে আসিয়া সেই ধাক্কা লাগিয়া আমাদের মস্তিস্ককে নাড়া দেয়; তাহাতেই আমরা জানিতে পারি যে, ওখানে একটা কি পদার্থ আছে এবং সেই পদার্থটার নাম রাখিয়া দিই সূর্য্য। ঈথর বা আকাশ আছে বলিয়াই আমরা অতবড় পদার্থের অস্তিত্বের জ্ঞান পাইতেছি।

আকাশ-সাগরের এই ঢেউগুলি বেগে বড় প্রবল, কিন্তু আকারে বড় ছোট, এক একটি ঢেউ লম্বে বড় কম। সাগরপৃষ্ঠে বাত্যাযোগে শতাধিক হাত দীর্ঘ এক এক বিশাল তরঙ্গ উঠে, পুকুরের জল নাড়িলে আধ হাত এক হাত দীর্ঘ এক একটি ঢেউ উঠিয়া থাকে; আবার অগভীর জলের উপর মৃদু বায়ু হিল্লোলে হয়ত এক আধ ইঞ্চি লম্বা, কি আরও ছোট ঢেউ উঠে। কিন্তু আকাশের যে ঢেউগুলি আমাদের আলোকজ্ঞান জন্মায়, তাহারা এক একটি এত ছোট যে, জলের ঢেউয়ের সহিত তাহার তুলনাই হয় না। তাহাদের দৈর্ঘ্য মাপিতে গেলে আর ইঞ্চিতে চলে না। ইঞ্চিকে লক্ষ ভাগ করিতে হয়। এই সকল আলোক-জনক ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য কত, তাহা একরকম মাপিয়া ঠিক্ করা হইয়াছে। গজকাঠি দিয়া কাপড় মাপিলে তাহাতেও যেমন বড় ভুল হয়

না, এ মাপেও তেমনি বড় ভুল নাই; বরং এ মাপ তার চেয়েও সূক্ষ্ম। কারণ, ঢেউগুলি এমনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে সাধারণ ইঞ্চির মাপ এখানে খাটে না—ইঞ্চির লক্ষাংশ লইয়া কারবার। ইহারই মধ্যে যে ঢেউগুলি একটু লম্বা, তাহাতেই লাল আলো দেয়; তার চেয়ে আর একটু লম্বা হইলে আর আমাদের চোখে ধরিতে পারে না। মাঝারি রকমের ঢেউগুলির মধ্যে কোনটা হল্‌দে, কোনটা সবুজ, কোনটা নীল আলো দেয়। আরও ছোট হইলে আমরা বেগুনি রঙ্ দেখি। তার ছোট হইলে আবার চোখে গ্রহণ করিতে পারি না।

আকাশের ঢেউ আসিয়া চোখে লাগিয়া মস্তিষ্কে নাড়া দিলে আলোর অনুভব হওয়া, আর সেই ঢেউগুলি যে অতি ক্ষুদ্র, এই ত গেল জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের পুরাণো কথা। এগুলি অনেকের পক্ষে নূতন নহে। কিন্তু আকাশেই যে আবার দুই হাত দশ হাত লম্বা, এমন কি দু' ক্রোশ দশ ক্রোশ লম্বা ঢেউ উঠিতে পারে, এবং সেরূপ বড় বড় ঢেউ অনবরত উঠিতেছে যাইতেছে, আমরা তাহার অস্তিত্ব ঘুণাক্ষরেও অনুভব করি না, এ কথা এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই জানিতেন না। মাক্সবেল প্রথমে ইহার সম্ভাবনা প্রমাণ করেন, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর করিয়া যান নাই। সম্প্রতি হার্টজ্ ও তাঁহার পথবর্ত্তীদের কল্যাণে স্কুলের বালকেরা প্রকৃতির এই রহস্য-ব্যাপার উদ্ঘাটিত দেখিয়া বিস্মিত হইতেছে; এবং কয়েক বর্ষ মধ্যে হয়ত আমরা এখনকার এই বেওয়ারিষ শক্তিসমষ্টিকে আমাদের সম্পত্তিগত করিয়া সংসারকার্য্যে নিয়োজিত করিব ও তাহাতে স্বত্ব লইয়া পরস্পর ঝগড়া করিব।

রহস্যটি এই। তাড়িত শক্তি ও চৌম্বক শক্তি যে দুইটা লইয়া

আমরা আজ কাল এত কাণ্ড করিতেছি, এ দুইটা ত আলোকের মত সেই একই আকাশেরই ক্রিয়াবিশেষ মাত্র। তাড়িত শক্তির নাম করিলেই পাঠকের মনে কাচ গালা তামা দস্তা এবং টেলিগ্রাফ ও তাহার আনুষঙ্গিক দুর্ব্বোধ্য জটিল যন্ত্র পরম্পরার উদয় হয়। এ সব যেন সাধারণের আলোচ্য নহে, কোনরূপ ভেল্‌কির ব্যাপার, ইহা স্বতই মনে আসে। কিন্তু সেরূপ ভয় পাওয়ার আবশ্যক নাই। তড়িতের উদ্ভব আমরা সচরাচর দেখিতে পাই—কোন বিকট যন্ত্র বা তন্ত্রমন্ত্রের আবশ্যক করে না। সচরাচর ব্যবহৃত কালোরঙের চিরুণী লইয়া যতবার চুল আঁচড়াই, চিরুণীর গায়ে ততবারই তাড়িত ভাবের বিকাশ হয়। চুলে আঁচড় দিয়া টুক্‌রা কাগজের উপর ধরিলেই কাগজ টুক্‌রাগুলি লাফাইয়া চিরুণির গায়ে লাগিতে আসে। একটা বিড়ালের গায়ে চাপড় মারিলেই হাত তখনি তড়িৎ ধর্ম্মযুক্ত হয়। শুধু কাচ আর রেসম কেন, যে কোন দুইটি দ্রব্য গায়ে গায়ে ঘর্ষণ পাইলেই দুইটিরই গায়ে তড়িতের বিকাশ হয়—তবে দ্রব্য বিশেষে বেশী আর কম। কাজেই তড়িতের বিকাশ নিত্য ঘটনা বলিতে হইবে। আমাদের উঠিতে বসিতে কাপড় পরিতে প্রতি পদবিক্ষেপে তড়িতের সঞ্চার হইতেছে, আমরা তাহার কোন খোঁজ রাখি না। আবার চৌম্বক শক্তি বলিলেই কম্পাসের কাঁটা, ডাক্তারদের ব্যাটারি ও বড় বড় ডাইনামো মেশীন মনে পড়ে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দ্রব্যমাত্রই ছোট বড় চুম্বক, তবে প্রবল আর দুর্ব্বল।

এই তড়িৎ ও চৌম্বকশক্তি কি, এতদিন তাহার বড় ঠিক্ ছিল না। ম্যাক্সবেল তাহা স্থির করেন। ঈথর বা আকাশ স্থিতিস্থাপক পদার্থ; ইস্পাতের স্প্রিং বা রবরের সূতা যেমন

জিনিষ, কতকটা সেই গোছের। টানিয়া ধরিতে জোর লাগে, আবার ছাড়িয়া দিলেই পূর্ব্বের অবস্থা পায়। কিন্তু পূর্ব্বের অবস্থা একবারে পায় না। স্প্রিংটি টানিয়া ছাড়িলেই বারকত ঘন ঘন দুলিতে থাকে, এবং দুলিতে দুলিতে থামিয়া যায়। অনেক জিনিষ আছে যাহা স্থিতিস্থাপক নহে; যেমন নরম মাটী, গালা, অথবা মোম। টানিলে বাড়িয়া বা বাঁকিয়া যাইবে, ছাড়িলে দুলিবেও না, পূর্ব্বাবস্থাও পাইবে না; বাড়িয়া ও বাঁকিয়াই থাকিবে। আকাশ কতকটা স্প্রিঙের মত; কোন অংশ একটু নাড়িয়া ছাড়িলে দুলিতে থাকে, এবং এইরূপ দুলিতে থাকে ও স্পন্দিত হয় বলিয়াই চারিদিকে ঢেউ উঠে; সেই স্পন্দন ও আন্দোলন ক্রমশঃ সংক্রামিত ও সঞ্চালিত হইয়াই ঢেউ উৎপাদন করে। জল ও বায়ু স্থিতিস্থাপক, কাজেই তাদের এক অংশের আন্দোলনে সমস্তটা আন্দোলিত হইয়া জলে তরঙ্গ ও বায়ুতে শব্দতরঙ্গ উৎপন্ন হয়। স্থিতিস্থাপক ঈথরে যখন টান পড়ে তখনি তাড়িত শক্তির বিকাশ হয়। রবরের সূতা দুই হাতে টানিয়া ধরিলে সেই সূতার যেমন অবস্থা হয়, কাচে রেশম ঘষিয়া কাচখানি সরাইয়া লইলে, চুলে চিরুণি ঘষিয়া চিরুণি খানি সরাইলে, উভয় দ্রব্যের মাঝে, কাচ ও রেসমের মাঝে, চুল ও চিরুণির মাঝে যে ঈথর থাকে তাহারও কতকটা সেইরূপ অবস্থা হয়। যে দ্রব্যে তাড়িত ভাবের বিকাশ দেখা যায়, তাহার পাশের ও চারিদিকের আকাশে যেন টান পড়িয়াছে। রবরের সূতা টানিয়া ধরায় দুই হাতে যেমন পাল্‌টা টান পড়ে, এক হাত আর এক হাতের কাছে যাইতে চায়; তেমনি মাঝের ঈথরে টান পড়ায় কাগজের টুক্‌রাগুলি চিরুণির দিকে বা কাচের দিকে যাইতে চায় ও লাফাইয়া উঠে।

তবেই তড়িৎ-শক্তি কিরকম, কতকটা বুঝা গেল। দুটা জিনিষ পরস্পর ঘষিয়া যত সরাইয়া লইবে, তাহাদের মাঝের আকাশও সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া যাইবে। হঠাৎ যদি জিনিষ দুইটা ছুঁইয়া দেওয়া যায় (একটার গায়ে আর একটা ছুঁইলে হয়, অথবা একটা তামার তার দিয়া দুটাকে স্পর্শ করিয়া দিলেও হয়,) তাহা হইলে ঈথরের টান অমনি আল্‌গা হইয়া যায়; স্প্রিংকে অথবা রবরকে টানিয়া হঠাৎ ছাড়িলে যেমন সে কয়েক-বার দুলিয়া দুলিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আইসে, সেইরূপ মাঝের ঈথরও বার কতক দুলিয়া আবার স্বাভাবিক অবস্থা পায়। ইহাকেই ইংরাজিতে ডিশ্‌চার্জ বলে। স্প্রিং বা রবারের সূতার যেরূপ আমাদের হস্তের অপেক্ষা অধিক জোর হইলে, নিজের দুই প্রান্ত হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া, টান আল্‌গা করিয়া লয়, তড়িৎ-শক্তিও সেইরূপ অধিক প্রবল হইলে মাঝের বাধাবিঘ্ন সকল নষ্ট করিয়া নিজের দুই প্রান্তকে একত্র করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মাঝে বাতাস থাকিলে জ্বলিয়া উঠে, কাচ থাকিলে ভাঙ্গিয়া যায়, মানুষের শরীর থাকিলে আঘাত লাগে। বজ্রপাতের পূর্ব্বে মেঘ ও ভূপৃষ্ঠ এই দুয়ের মধ্যে সমগ্র আকাশ-টায় ঐরূপ টান পড়ে। টান অতিরিক্ত হইলেই বায়ুস্তর প্রভৃতি ব্যবধান ছিন্ন করিয়া ডিশ্‌চার্জ হয়; সমগ্র ঈথরটা কাঁপিয়া উঠে; কোন হতভাগ্য জীব সম্মুখে পড়িলে তাহার শরীরটাও ছিঁড়িয়া যায়।

তড়িতের বিকাশ যেমন আমাদের নড়িতে চড়িতেই হইতেছে, এই ডিশ্‌চার্জও সেইরূপ অলক্ষিতে নিয়তই হইতেছে। প্রতি ডিশ্‌চার্জেই খানিকটা ঈথর স্প্রিঙের মত দুলিয়া উঠে, এবং খানিকটা দুলিলেই সেই আন্দোলন চারিদিকে আকাশসাগরে

সংক্রামিত ও ব্যাপ্ত হয় তাহার আর সন্দেহ কি। সুতরাং প্রতি ডিশ্‌চার্জেই ঈথরে ঢেউ উঠিতেছে। এ ঢেউগুলি বড় ছোট নহে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু নড়িয়া ঈথরে ধাক্কা দিলে যে ছোট ছোট ঢেউ উঠিয়া আলোক উৎপাদন করে, এই সব তাড়িত ডিশ্‌চার্জের ঢেউ অবশ্য তাহার সঙ্গে তুলনীয় নহে। এই সব তরঙ্গ কেহ হাত হিসাবে কেহ বা মাইল হিসাবে দীর্ঘ, আর আলোক তরঙ্গের বেলায় বলিতে হইবে এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

কথাটা এই। আকাশে ছোট বড়, অতি ছোট হইতে অতি বড় পর্য্যন্ত, ঢেউ প্রতিনিয়তই উঠিতেছে। আকাশে কোন রকমে টান বা আঘাত পড়িলেই এই সব ঢেউ উৎপন্ন হইয়া প্রবলবেগে দিগন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। তপ্ত পদার্থের পরমাণুগুলির ধাক্কায় যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মি উঠে, সেইগুলি—তাহারও সব নহে, কতকগুলি মাত্র—আমাদের চক্ষুরূপ সুকৌশল যন্ত্রযোগে মস্তিষ্কে ধাক্কা দিয়া দূরস্থ পদার্থের খবর দেয়। আর বাকী সমুদয় ছোট বড় উর্ম্মি, যত মাইল দীর্ঘ হউক, আমাদের উপর দিয়া নিয়ত চলিয়া যাইলেও উপযুক্ত ইন্দ্রিয় বা যন্ত্রের অভাবে এতকাল অলক্ষিত রহিয়াছে।

মাক্সবেলই প্রথমে স্থির করেন যে, যে ঈথরে ঢেউ উঠিলে আলোক হয়, সেই ঈথরেই কোনরূপ টান পড়িলে তাড়িত ভাবের আবির্ভাব হয়; এবং ঈথর যখন এত স্প্রিঙের মত, তখন সেই তাড়িতভাব লোপের সময় অর্থাৎ ডিশ্‌চার্জের সময় বড় বড় ঢেউ উঠিবারও সম্ভাবনা। জর্ম্মণ অধ্যাপক কৌশলক্রমে তাহাদের প্রকৃত অস্তিত্ব সাধারণের প্রত্যক্ষ করিয়া আলোক ও তড়িতের সম্বন্ধ নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এক ফুট দীর্ঘ

এক ইঞ্চি পুরু পিত্তল দণ্ডকে তড়িৎযুক্ত করিয়া, ডিশ্‌চার্জ করিলে চারিদিকের ঈথরে যে ঢেউ উঠে, তাহা প্রায় এক হাত লম্বা। কাচের বোতলের ভিতর ও বাহির পাতলা টিনের রাংতায় মুড়িয়া যে তড়িৎ-সঞ্চয়ের যন্ত্র সচরাচর প্রস্তুত হয়, ইংরাজীতে যাহাকে লীডেনজার বলে, তাহা ডিশ্‌চার্জ করিলে আরও বড় বড় ঢেউ উঠে। আমাদের চিরপরিচিত আলোকরেখা বা রশ্মিগুলি যেমন মসৃণ পদার্থের পরে পড়িয়া প্রতিফলিত হয় বা ফিরিয়া আইসে, স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশ করিয়া বিবর্ত্তিত হয় বা বাঁকিয়া যায়; হার্টজের কৌশলে এই নবাবিষ্কৃত দীর্ঘ উর্ম্মির রশ্মিও সেইরূপ প্রতিফলিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে দেখা গিয়াছে।

শুদ্ধবের

সাহিত্যের উপাদান।

সত্য অনেকে অনেক রকম করে' বোঝাতে চেষ্টা করেচেন। ন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেন যে, সত্য হচ্চে বাহ্য প্রকৃতির ত চিন্তার সামঞ্জস্য। কেউ কেউ আবার মন ছাড়া আর র অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান না—তাঁরা বলেন, যে, সত্য পরম্পরার সুসংলগ্নতা। কিন্তু এঁরা কেবল বাহ্য মনঃপ্রকৃতির সম্বন্ধের মধ্যে যে সত্য আছে তারই আলোকে অন্ধকার দূর হয়, আগুনে হাত পোড়ে ম্বন্ধেই তাঁদের উক্তি।

সাহিত্যের সত্য বল্‌তে চাও সে একটা দ। সাধারণতঃ যাকে সত্য বলা যায়, জীবনচরিতের সত্য, সে তোমার

সাহিত্যের সত্য হতে পারে না। যদি হত তবে কবিতা খুঁজে সত্যই পাওয়া যেত না, সমস্ত মিথ্যা হত। কেননা, রোমিয়ো বলে' কোন লোকই ছিল না—আর, জুলিয়েট তার প্রেমেও পড়েনি এবং বিষও পান করেনি।

তুমি বল্‌চ, লেখকের জীবনের মূলতত্ত্বই সাহিত্যের সত্য। মূল তত্ত্ব বল্‌তে তোমার ভাবটা এই—আমাদের আত্মার সহিত প্রকৃতির অথবা ঈশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে একটা মতামত আমাদের মনে ক্রমশ যতই গাঢ় হতে থাকে, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে নীতি সম্বন্ধে ভালবাসা সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাব ততই বিজড়িত হয়ে একটা বিশেষরূপ ব্যক্তিগত আকার ধারণ পূর্ব্বক আমাদের মনে বদ্ধমূল হতে থাকে। এই একটি ভাবসমষ্টিকে জীবনের মূলতত্ত্ব বলা যায়।

তাই যদি হয় তবে দেখা আবশ্যক সেটা প্রকাশ না ক...
সাহিত্য হয় কিনা।

মনে কর যে, কেউ এমন করে' বর্ণনা করতে পারত... আমরা সেই বর্ণনা পড়ে' সূর্য্যাস্তের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন চো... সাম্‌নে দেখ্‌তে পেতুম, তাহলে কি এই বর্ণনাকে তুমি স... ত্যের মধ্যে গণ্য করতে না? এই বর্ণনায় লেখকের জী... মূলতত্ত্ব থাকবার কোন দরকার নেই, সূর্য্যাস্তটা ... মাদের মনে অঙ্কিত হওয়া নিয়ে কথা।

তুমি বল্‌চ শেক্সপিয়রের নাটকের পাত্রগ... পিয়রের মূর্ত্তি পাবই পাব—আমরা চিন্‌তে ... মনে কর যে শেক্সপিয়রের নাটকগুলো গা... কি তার কম মূল্য হত!

তুমি বল্‌বে যে, জীবনের মূল...

াওয়া যায়। আমি বলি যে, সমস্ত ভাল নাটকেই মূলতত্ত্ব
য়া যায়;—কেন না, যেথানে মানুষ আঁকা হয়েচে সেখানে
ষের জীবনের মূলতত্ত্ব খানিকটা থাক্‌বেই—তা নইলে মানু
ক ভাল রকমে আঁকা হল না। কিন্তু লেখকের জীব
মূলতত্ত্ব কি তাতে থাক্‌বেই থাক্‌বে, কিম্বা না থাক্‌লে
ত্য হবে না?

হিত্যে মানুষকে মানুষ চেনায় বটে, কিন্তু তার
ষের কাছে চিরকাল প্রিয় সামগ্রী, এই জন্যই
য়। সাহিত্যের উদ্দে যেকালে
খে দেওয়া তখন হাতের কাছে এমন এক
র ছাড়তে পারে না। মানুষ ভাবত সামাজিক,
-প্রয়াসী, এই জন্য মা নের মত এমন
আর নেই। সাহিত্য আমাদের মনোহরণের
কম চিত্তরঞ্জক বিষয় বেছে নেয়—কিন্তু এ গুলো
মাত্র, এ তার উদ্দেশ্য নয়। যেমন ভাস্করমূর্ত্তি
পাথর খোদে, কিন্তু পাথর কাটাই যে ভাস্করের
য় না।

স্থবিশেষে প্রকাশিত মূলতত্ত্বকে তুমি মিথ্যা
তাতে যে সৌন্দর্য্যের ছবি ধরা হয়েছে সে
র আনন্দ হয় না বরং কষ্ট হয়। সে হিসাবে
আর্টিষ্টিক্ বল্‌তে প্রস্তুত আছি। আমি টৈয়ো-
তোমার মতামত নিয়ে কিছু বল্‌চিনে—
গোটিয়ে তার নিজের মূলতত্ত্ব তার

নিয়েই যদি কথা হয় তা হলে ত গোটিয়েকে কোন দোষ দেওয়া
যায় না।

আসল আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, সাহিত্যের
অন্য সমস্ত আর্টের কার্য্য একই—কেবল উপাদা
। অনেক সময় লেখকের নিজত্ব প্রকাশ সাহিত্যের একট
উপাদান মাত্র। লেখকের নিজত্বকে ত্যাগ করে' ত
উপযোগী বিষয়কে অবলম্বন করলেও সাহিত্য সা
। অনেক বিষয় আছে যা' সাহিত্যের অনুপযো
ভাস্করের অনুপযোগী। এমন
হ, এবং সে বিষয়টিকে এমন ভাবে দাঁড় করা
আমাদের আর্টিষ্টিক্ আনন্দ দিতে পারে।
আগ্রহ ভালবাসা ইত্যাদিকে যদি উপযুক্তরূপে
যায় তবে তাতে আমাদের আর্টিষ্টিক্ সুখ হয়।
তত্ত্ব, নিজের নিজত্ব, নৈতিক সত্য, দার্শনিক স
আর্টিষ্টিক্ সুখের উপাদান স্বরূপে ব্যবহৃত হতে
উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সুখ। সকল আর্টই আমাদে
উদ্রেক করে' সুখ দেয়। সঙ্গীত একপ্রকার
আমাদের চিত্তকে বিচলিত করে, চিত্র এবং
বিশেষরূপ ভাবোদ্রেক করে। সাহিত্যের ক্ষে
চেয়ে বিস্তৃত। কারণ, সাহিত্যের অবলম্বন
মানবের সমস্ত অভিজ্ঞতার প্রসর অধিকার কে
ভাষার সাহায্যে সাহিত্য অনেক বেশি রব
বৃত্তি উদ্রেক করতে পারে—সেই

উপাদান—তখন যে সেই চিন্তা এবং ভাষা যোগে আমাদের নিজত্ব কতক পরিমাণে সাহিত্যে প্রতিফলিত হবেই তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্যের পক্ষে সেটা মুখ্যরূপে আবশ্যক নহে সেটা আনুষঙ্গিক মাত্র। সঙ্গীতেও রচয়িতা অথবা গায়কের আত্মস্বরূপ কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ পায়, চিত্র এবং মূর্ত্তিতেও তদ্রূপ। মানুষে যাই করুক না কেন তাতে তার নিজত্ব একটু থাক্‌বেই। কিন্তু আর্টের মধ্যে সেইটেকেই যে সর্ব্বময় প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক তা আমি মান্‌তে পারি নে।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

সোশ্যালিজ্‌ম্।

বিলাতী খবরের কাগজে দেখা যায় য়ুরোপে সোশ্যালিষ্ট সম্প্রদায়ের উপদ্রব প্রতিদিন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ইহাদের দ্বারা সেখানে আজ হউক বা দুই দিন পরে হউক, একটা ...ও সামাজিক বিপ্লব ঘটা অসম্ভব নহে। অতএব সোশ্যা... মতটা কি তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে কৌতূহল জন্মে। ...শ্যালিষ্ট দিগের মধ্যে যে মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে ... তাহাদিগের সকল মতগুলির বিস্তারিত ...হ। আমরা এস্থলে কেবল বেল্‌ফর্ট্‌ ... তাঁহার মত সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। ... যাঁহারা কোন কোন প্রচলিত ... করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ও ... "লিবারাল্" কহিয়া থাকে।

এই লিবারাল্‌দিগের সহিত সোশ্যালিষ্ট্‌দিগের কোথায় প্রভেদ ব্যাক্স্‌ সাহেব তাহারই আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, এককালে রাজা ও প্রধানবর্গের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব ছিল; তাহারই বিরুদ্ধে যে চেষ্টা হয় তাহাকেই "লিবারালিজ্‌ম্‌" বলা হইয়া থাকে। প্রজাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই স্বাধীন অর্থ-সঞ্চয় এবং সম্পত্তি উপার্জ্জনের অধিকার এই চেষ্টার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। এই লিবারালদের সাহায্যে এমন সকল নিয়ম প্রচলিত হয় যাহাতে সকলের বিষয় সম্পত্তি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হইতে পারে।

কিন্তু এখন আবার এই স্বাধীনতা নূতন অধীনতার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এখন ধনের কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বময় হইয়া উঠিতেছে। ধনকে সুরক্ষিত করিয়া লিবারালিজ্‌ম্‌ কেবল ধনীরই সুবিধা করিতেছে; সর্ব্বসাধারণকে তাহার সম্যক্‌ সুখ ও উন্নতি হইতে বঞ্চিত করিতেছে।

সোশ্যালিজ্‌ম্‌ ধনীর কর্ত্তৃত্বের স্থলে মানব-সাধারণের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে।

কলের সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে একটি নূতন বিপ্লবের স[illegible] পাত হয়। কলের দ্বারা দুইটি দলের উৎপত্তি হইয়াছে। কলওয়ালা নব্য উন্নতিশীল, আর এক, কর্ম্মচ্যুত প্রাচী[illegible] করের দল।

এক সময় ছিল, যখন কারিকরের ব[illegible] পণ্য নির্ভর করিত। তখন, তাহা[illegible] ছিল। আপনার বুদ্ধি ও কৌশলে[illegible] নিজের গুমরে থাকিতে পারিত।

এখন কলে পণ্য উৎপন্ন [illegible]

নৈপুণ্যজাত স্বাধীনতার স্বভাবতই হ্রাস হইয়া কলওয়ালা ধন-ক্ষমতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিয়াছে।

সোশ্যালিষ্ট্রা চাহে, যে, এই পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ কোন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে না থাকিয়া সাধারণ সমাজের হস্তে পড়ে। তাহারা বলে, ধন উৎপাদন এবং বণ্টন সমস্ত সমাজের কাজ। সম্প্রতি কেবল সম্পত্তিবান ব্যক্তিদের মর্জ্জি এবং স্বার্থের উপরে তাহার নির্ভর থাকাতে জন সাধারণ স্ব স্ব অবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতির সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

ধনের অধীনতা সামান্য নহে। ডাকাত যদি পিস্তল দেখাইয়া বলে 'টাকা দে নয় মারিব' সেও যেমন, তেমনি কলওয়ালা মহাজন যখন বলে 'হয় এমনি করিয়া খাট্, নয় মর্' সেও তদ্রূপ। যে নির্দ্ধন সে একেবারে নিরুপায়। যখন ধন এবং জমী সাধারণের মধ্যে বিলি হইবে তখন এমন দৌরাত্ম্য হইতে পারিবে না।

তাহা ছাড়া কাজ এখনকার চেয়ে অনেক ভাল হইবে। দৃষ্টান্ত। মনে কর, সোশ্যালিষ্ট্ বিধানমতে কোন এক লোকের উপর সরকারী রুটি তৈয়ার করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। লোকটা রুটি যদি খারাপ করিয়া গড়ে তবে তাহার নিজের এবং সমাজের অসুখের কারণ হইবে। কাজে গোঁজামিলন দিয়া অথবা সস্তা মালমস্লা যোগ করিয়া তাহার কোন লাভ নাই—কারণ, সে বেতনও পায় না মূল্যও পায় না,—সমাজের আদেশ-মতে কাজ করে। অতএব, যখন মন্দ রুটি গড়িয়া তাহার কোন লাভ নাই এবং ভাল রুটি গড়িলে তাহার নিজের এবং সমস্ত সমাজের পরিতোষের কারণ হইবে তখন ভাল রুটি গড়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বণিক মহাজনের স্বার্থই এই যত

ায় কাজ করিতে পারে—অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে জিনিষটা ভাল করিবার দিকে তাহার কোন দৃষ্টি থাকে না।

অনেকে বলিয়া থাকেন ধনের সহিত স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য যোগ। যাহার ধন নাই তাহাকে স্বভাবতই নানা বিষয়ে অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে অতএব নির্দ্ধনকে স্বাধীনতা দিবার জন্য সোশ্যালিষ্টগণ যে পণ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। গ্রন্থকর্ত্তা তদুত্তরে বলেন ধনহীন স্বাধীনতা অসম্ভব, কথাটা সত্য। সেই জন্যই ধন সাধারণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক—কারণ, তাহা ব্যতীত স্বাধীনতা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে কিছুতেই ব্যাপ্ত হইতে পারে না।

অতএব দেখা যাইতেছে সর্ব্বসাধারণের স্বাধীনতাই সোশ্যালিজ্‌মের উদ্দেশ্য। এখন, কথা উঠিতে পারে, যে, উদ্দেশ্য যাহাই হোক্ ফলে বিপরীত হইবে। কারণ, এখন স্বার্থের তাড়নায় লোকে খাটিতেছে এবং সমাজের কাজ চলিয়া যাইতেছে কিন্তু ধনের প্রলোভন চলিয়া গেলে সমাজের তাড়নায় লোককে কাজ করিতেই হইবে, সে পীড়ন কম নহে। সকলেই ইচ্ছামত আলস্যে নিযুক্ত থাকিলে কখন সমাজ টিঁকিতে পারে না, অতএব একটা কোনরূপ পীড়নের প্রথা থাকিবেই। গ্রন্থকার বলেন, একেবারে কোনরূপ পীড়ন ব্যতীত সংসার চলে না, এখনকার বিধানমতে সমাজে অন্ধ পীড়নের প্রাচুর্ভাব, কিন্তু সোশ্যালিজ্‌মের নিয়মে সমাজে যুক্তি ও বিবেচনা-সঙ্গত যথাবশ্যক সুসংযত পীড়ন প্রচলিত হইবে। এবং স্বার্থের সংশ্রব না থাকাতে সে পীড়ন ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে এরূপ আশা করা যায়।

ব্যাক্স্ সাহেব বলেন, আদিম কালে সাধারণের মধ্যে ধনের বিভাগ ছিল সভ্যতার প্রাচুর্ভাবে ক্রমে তাহার ব্যত্যয় হয়

ক্রমে সকলের স্ব স্ব প্রধান হইবার বাসনা জন্মে, প্রধান হইতে চেষ্টা করিলেই স্বভাবত দুই বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সৃষ্টি হয়। এইরূপে সামাজিক ঐক্য নষ্ট হইয়া পার্থক্যের জন্ম হইতে থাকে। পূর্ব্বে কেবলমাত্র বহির্জাতির সহিত শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এখন প্রত্যেকে বড় হইতে চেষ্টা করিয়া ঘরের মধ্যে দলাদলি ঘটিতে থাকে। সভ্যতার স্বাভাবিক ফল এই। ইহার প্রধান লক্ষণ, সমাজের সহিত ব্যক্তির বিরোধ—প্রত্যেকের সমগ্রের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা।

সোশ্যালিজ্‌ম সকলের মধ্যে ধনের সমবিভাগ করিয়া দিয়া পুনশ্চ সকলকে একতন্ত্রের মধ্যে বাঁধিতে চাহে এবং এই উপায়ে সকলকে যথাসম্ভব স্বাধীনতার অধিকারী করিতে চাহে, মানব-সমাজে ঐক্য এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য ইহার উদ্দেশ্য।

ইংলণ্ডের আত্মানুসন্ধায়ী সভা।

প্রায় ৮। ১০ বৎসর হইল ইংলণ্ডে "আত্মানুসন্ধায়ী সভা" স্থাপিত হইয়াছে। প্রেত-দর্শন, ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্ব্বাভাস, সম্মোহন তত্ত্ব, (Hypnotism) দিব্যজ্ঞান (clairvoyance) প্রভৃতি আশ্চর্য্যজনক অলৌকিক কাণ্ড সকলের যথার্থ তথ্য কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা এই সভার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আশ্চর্য্য ঘটনা-গুলি সমিতির সভ্যেরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান ও তাহার অকাট্য প্রমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক বিচার করিয়া থাকেন। অনেক বিচক্ষণ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এই সভার সভ্য। কিছু কাল পূর্ব্বে অধ্যাপক ব্যালফোর ষ্টুয়ার্ট ইহার সভাপতি ছিলেন—

এক্ষণে পণ্ডিতবর অধ্যাপক হেন্‌রি সিজ্‌বিক ইহার সভাপতি। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সমিতি আত্ম-তত্ত্ব-সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন জানিবার জন্য স্বভাবতই আমাদের কৌতূহল হয়। সভাপতি সিজ্‌বিক ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তারিখে উক্ত সভায় যে বক্তৃতা করেন তাহা পাঠ করিলে সভার কি উদ্দেশ্য ও সেই উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে তাহা আমরা অবগত হইতে পারি।

তিনি এই মর্ম্মে বলেন—"আমাদের এ কালে মানব-আত্মার প্রকৃতি ও গতি লইয়া কতই না বাদানুবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে—পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ মনান্তর উপস্থিত হইতেছে; এই সব কষ্টকর ব্যাপার দেখিয়াই আমরা গোড়ায় এই সভা স্থাপনে প্রবৃত্ত হই। এক পক্ষে, খৃষ্টীয় শিক্ষার প্রভাবে সাধারণ সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই বিশ্বাসটি প্রবল যে, আমাদের আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র ও দেহের বিনাশে ইহার বিনাশ হয় না। পক্ষান্তরে আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদ্যার সাধারণ মত উক্ত কল্পনার বিরোধী—শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, কোন ব্যক্তির মানসিক জীবন ও ক্রিয়া-পদ্ধতি তাহার শারীরিক জীবন ও ক্রিয়া-পদ্ধতির সহিত অবিচ্ছিন্ন রূপে সংযুক্ত—দেহের বিনাশে আত্মারও বিনাশ হয়। কিন্তু আমরা কোন পক্ষেরই গোঁড়া নহি। আধুনিক বিজ্ঞান-পদ্ধতিতে আমাদের দ্বিধা-শূন্য বিশ্বাস আছে বটে; সমবেত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর যুক্তি-যুক্ত সিদ্ধান্ত আমরা নতশিরে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নহি সত্য কিন্তু তাই বলিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের কুসংস্কার-সকল আমরা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বিরুদ্ধ পক্ষের প্রমাণ সকল ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়াই নিজের

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—তাঁহাদের বিচার-পদ্ধতি এই বিষয়ে বিজ্ঞান-সিদ্ধ পদ্ধতির অনুগত নহে। আমরা এই অভাব পূরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম; আত্মার স্বতন্ত্রতা সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ আমাদের হস্তগত হইবে তাহা আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিব, ইহাই আমাদের সভার উদ্দেশ্য ছিল। এক্ষণে এই উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে দেখা আবশ্যক।

একটি মন অপর মনের উপর যে প্রভাব প্রকটন করে সেই প্রভাব দূর হইতে যখন অপর মনটি জানিতে পারে, তাহাকে টেলিপ্যাথি অর্থাৎ "দূরানুভূতি" বলা যায়—এই দূরানুভূতি ব্যাপারের গুরুতা আমরা পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি; এবং সম্মোহন ব্যাপারের তথ্য নির্ণয়ার্থ আমরা একটি পৃথক উপ-সমিতি স্থাপন করিয়াছি—সম্মোহিত অবস্থায় বিশেষরূপে যে দূরানুভূতিক কাণ্ড সকল প্রকাশ পায় তাহাও আমরা দেখিয়াছি। মৃত্যুকালে যে সকল উপছায়ার আবির্ভাব দেখা যায় তাহা আমরা পূর্ব্বে ভূতের গল্পশ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত করিতাম—কিন্তু ক্রমশ আমরা জানিতে পারিয়াছি যে পীড়িতাবস্থায়, জীবনের সঙ্কটাবস্থায় কিম্বা মৃত্যুমুহূর্ত্তে আমরা যে উপছায়া দেখিতে পাই তাহাও দূরানুভূতির প্রকার-ভেদ মাত্র। আরও ইহার প্রমাণ এই পাওয়া গিয়াছে যে, আমরা মৎলব করিয়া ও ইচ্ছা করিয়াও এইরূপ উপছায়া উৎপাদন করিতে পারি—ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। এই সকল মৃত্যু-কালীন প্রেত-দর্শন মনের বিভ্রম মাত্র—উহা বাস্তবিক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। যতক্ষণ না আমরা অশরীরী প্রেতাত্মার বিশিষ্ট প্রমাণ পাই ততক্ষণ আমাদের এইরূপ মনে করিতে হইবে যে শরীরী

আত্মারই কোন গুপ্ত শক্তির দ্বারা এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়।"

অধ্যাপক সিজ্‌বিক ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি তারিখে "আত্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী সভায়" যে বক্তৃতা করেন তাহার এক স্থলে এইরূপ বলেন—"আমাদের সভার অস্তিত্বের ৬ বৎসর কাল মধ্যে আমাদের সভার অধীন একটি উপসমিতি ১২০০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া "দূরানুভূতি" বিষয়ক মতের অনুকূলে নিজ অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং আর একটি উপসমিতি মাদাম ব্লাভাট্‌স্কির অলৌকিক শক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন।"

অতএব দেখা যাইতেছে, "আত্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী সভা" এখনও প্রেতাত্মার অস্তিত্বের কোন চূড়ান্ত প্রমাণ পান নাই। এই সমস্ত অলৌকিক ব্যাপার তাঁহারা একটা "দূরানুভূতি" শক্তি (telepathy) কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

পহুঁ।

(১)

প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে এমন সকল শব্দ পাওয়া যায় যাহাদের অর্থ করিতে যথেষ্ট পাঠ ও চিন্তার প্রয়োজন; অনেক সময় সে সকল শব্দ সংস্কৃতমূলক হইয়া থাকে, সেরকম স্থলে তাহাদের পঙ্কোদ্ধার তত দুরূহ নয়, কিন্তু যখন কোন শব্দের ধাতু অন্তর্জলীর রোগীর নাড়ীর মত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিম্বা শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগ দেখিয়া অর্থ আবিষ্কার

দুর্ঘট হইয়া পড়ে, তখন বড় বিপদ। 'নিছনি' লইয়া ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করায়, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চেষ্টায় তাহার অর্থ যথেষ্ট পরিষ্কার হইয়াছে, এবং তাহাতে আমাদের আশা হইয়াছে এইরূপ আলোচনায় প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে ব্যবহৃত অনেক দুর্ব্বোধ্য শব্দ সাধারণের বোধগম্য হইতে পারিবে।

প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীতে আর একটি শব্দের খুব প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, সে শব্দটি 'পহুঁ', কোথাও চন্দ্রবিন্দু আছে, কোথাও নাই; ইহা সংস্কৃত শব্দ, কি সংস্কৃত ধাতুমূলক বাঙ্গলা বা মৈথিলী কিম্বা অন্য কোন ভাষায় প্রচলিত গ্রাম্য শব্দ, তাহা নির্ণয় করিয়া উঠা কঠিন; বোধ হয় একের বেশী অর্থেও 'পহুঁ' ব্যবহৃত হয়; যাঁহারা এ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করিবেন তাঁহাদের কতকটা সুবিধা হইবে ভাবিয়া নিম্নে কয়েকটি পদাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

একস্থানে আছে

"গোরা 'পহুঁ' বিরলে বসিয়া।

জ্ঞানদাসে আছে

"অবনত বয়নে না কহে কিছু বাণী
পরশিতে বিহসি ঠেলই 'পহুঁ' পাণি।"

অন্যত্র

"ধরি 'পহুঁ' হাসি আলিঙ্গন দেল।"

বিদ্যাপতি বলিয়াছেন

"চরকি চরকি পড়ু লোচন লোর
কত রূপে মিনতি করল 'পহুঁ' মোর।"

অনন্তদাস বলেন

"রসের আবেশে দুহুঁ হইলা বিভোর
দাস অনন্ত 'পহুঁ' না পাওল ওর।"

অন্যতম পদকর্ত্তা রসিকদাস একস্থানে বলিয়াছেন

"যৈছন চতুর শঠের 'পহুঁ'
তৈছন তাহার দূতী সে তুহুঁ।"

এইরূপে প্রায় সকল পদকর্ত্তাই 'পহুঁ' শব্দে প্রভুর ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, একটু চিন্তা করিলেই মনে হয় 'পহুঁ' 'প্রভু' শব্দের অপভ্রংশ হইলেও হইতে পারে; এবং 'পহুঁ মোর শ্রী নিবাস' ইত্যাদি পাঠ পড়িলে সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না; উদ্ধৃত অংশগুলিতেও 'পহুঁ'র অর্থ 'প্রভু' ধরিয়া লইলে কিছু অসঙ্গত হয় না। 'পহুঁ' শব্দ ছাড়াও 'পহুঁক' কথাটি মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"কহ রাধামোহন 'পহুঁক' বলিহারী।"

অন্যত্র

"পহুঁক প্রতাপ মন্ত্র করু যাপে।"

গোবিন্দদাস একস্থানে বলিয়াছেন

"পহুঁক চরণযুগ সারথী করবি।"

বিদ্যাপতিতেও আছে

"ধনি অলপ বয়েস বালা
জনু গাঁথনি 'পহুঁক' মালা।" *

'পহুঁক' যদি 'প্রভু' শব্দ হইতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'পহুঁক' এর অর্থ 'প্রভুর' বলিলে বোধ করি অসঙ্গত হয় না।

---

* পহুক মালা ঠিক নহে, পহুপ মালা অর্থাৎ পুষ্পের মালা হওয়া উচিত।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিন্তু এ সমস্তই অনুমানের উপর বলা হইতেছে। যাহা হউক ব্যাপার এখানেই যদি শেষ হইত তাহা হইলে প্রশ্নটা জটিল হইয়া পড়িত না, কারণ তাহা হইলে 'পহুঁ'র .এই একটা অর্থ ধরিয়াই চলা যাইত ; কিন্তু 'পহুঁ' এরকম স্থানেও প্রয়োগ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় যেখানে 'পহুঁ'র অর্থ 'প্রভু' ধরিয়া লওয়া সঙ্গত বোধ হয় না ; আর যদি বা টানিয়া বুনিয়া সেরূপ ভাবে ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে পদ নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে, নিম্নে তাহারো দু একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, যথা

"গোবিন্দদাস 'পহুঁ' নটবর শেখর নাচত গাওত তালধারী।"

অন্যত্র

"গোবিন্দদাস 'পহুঁ' জগমনমোহন বিহরই ভেল কলপসম রাতি।"

আর একস্থানে

"রাধামোহন 'পহু' দুহু অতি নিরুপম ত্রিভুবন করু অবতংশ।"

এবং

"রাধামোহন 'পহুঁ' রসিক শুনাহ।"

নরোত্তম দাস বলিয়াছেন

"নরোত্তম দাস 'পহুঁ' নাগর কান
রসিক কলাগুরু তুহুঁ সব জান।"

বাহুল্য ভয়ে আর বেশী উদ্ধৃত করিলাম না ; উদ্ধৃত পদগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে পহুঁ যদি ক্রিয়ারূপে ব্যবহার করা না যায় ত পদগুলি সম্পূর্ণ হয় না ; সুতরাং 'রাধামোহন পহু রসিক শুনাহ' অর্থ রাধামোহন 'বলিতেছেন' বা 'বলেন' এবং রসিকগণ 'শুনিতেছেন' বা 'শুনেন' এরূপ বলা, কিম্বা "নরোত্তম দাস পহুঁ নাগরকান রসিক কলাগুরু তুহুঁ সব জান।" পদের অর্থ নরোত্তম দাস বলিতেছেন "হে নাগর কান তুমি রসিক

এবং কলাগুরু অতএব তুমি সকলই জান," এরূপ বলা অসঙ্গত নহে। বাস্তবিকই শেষ উদ্ধৃত পদগুলিতে 'পহুঁ'র 'বলেন' বা 'বলিতেছেন' এরূপ অর্থ না করিলে গোবিন্দদাস, রাধামোহনদাস ও নরোত্তমদাস ক্রিয়াহীন হইয়া পড়েন, কিন্তু ক্রিয়াহীন কর্ত্তার ব্যবহার কোন ক্রমেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; যাহা হউক একটু আলোচনা দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পহুঁ।

(২)

বৈষ্ণব কবিদের গ্রন্থে সচরাচর পহুঁ শব্দের দুই অর্থ দেখা যায়, প্রভু এবং পুনঃ। শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের টীকায় লিখিয়াছেন "পহু" অর্থে প্রভু এবং "পঁহু" অর্থে পুনঃ। কিন্তু উভয় অর্থেই পহুঁশব্দের ব্যবহার এত দেখা গিয়াছে যে নিশ্চয় বলা যায় এ নিয়ম এক্ষণে আর খাটে না।

দীনেন্দ্র বাবু যতগুলি ভণিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন প্রায় তাহার সকলগুলিতেই পহু ও পহুঁ শব্দের অর্থ প্রভু। "গোবিন্দদাস পহুঁ নটবর শেখর" অর্থাৎ গোবিন্দদাসের প্রভু নটবর শেখর। "রাধামোহন পহুঁ রসিক সুনাহ" অর্থাৎ রাধামোহনের প্রভু রসিক সু-নাথ। "নরোত্তমদাস পহুঁ নাগর কান, রসিক কলাগুরু তুহুঁ সব জান" ইহার অর্থ এই—তুমি নরোত্তমদাসের প্রভু নাগর কান তুমি রসিক কলাগুরু তুমি সকলি জান। এরূপ ভণিতা হিন্দী গানেও দেখা যায় যথা, "তানসেনপ্রভু আকবর।"

বৈষ্ণব পদে স্থানে স্থানে সমাস ভাঙ্গাও দেখা যায়, যথা "গোবিন্দদাসের পহু হাসিয়া হাসিয়া রহু।"

কেবল একটা ভণিতায় এই অর্থ খাটে না। "রাধামোহন পহুঁ দুঁহু অতি নিরুপম"—এস্থলে "পহুঁ"র "ভণে" অর্থ না হইলে আর কোন অর্থ পাওয়া যায় না।

আমি যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে গোবিন্দদাস এবং তাঁহার অনুকরণকারী রাধামোহন ব্যতীত আর কোন বৈষ্ণব কবিতায় পহুঁ শব্দের এরূপ অর্থ নাই। রাধামোহনেও ভণে অর্থে "পহুঁ"র ব্যবহার অত্যন্ত বিরল—দৈবাৎ দুই একটি যদি পাওয়া যায়। "রাধামোহন পহুঁ তুয়া পায়ে নিবেদয়ে" এস্থলে পহুঁ অর্থে পুনঃ এবং অন্যত্র অধিকাংশ স্থলেই পহুঁ অর্থে প্রভু। কিন্তু গোবিন্দদাসের অনেক স্থলে "পহুঁ"র "ভণে" অর্থ ব্যবহার দেখা যায়। "গোবিন্দদাস পহুঁ দীপ সায়াহ্ন, বেলি অবসান ভৈ গেলি।" অর্থাৎ গোবিন্দদাস কহিতেছেন বেলা অবসান হইয়াছে সন্ধ্যাদীপের সময় হইল। ইহা ছাড়া এস্থলে আর কোনরূপ অর্থ কল্পনা করা যায় না। আরও এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে কথা এই, কোন্ ধাতু অনুসারে "পহুঁ"র ভণে অর্থ স্থির হইতে পারে? এক, "ভণহুঁ" * হইতে "ভহুঁ" এবং ক্রমে পহুঁ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে—কিন্তু ইহা একটা কাল্পনিক অনুমান মাত্র। বিশেষতঃ যখন গোবিন্দদাস ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন পদকর্ত্তার পদে পহুঁর এরূপ অর্থ দেখা যায় না তখন উক্ত অনুমানের সঙ্গত ভিত্তি নাই বলিতে হইবে।

---

* ভণহুঁ বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতী।

আমার বিবেচনায় পূর্ব্বোক্তরূপ ভণিতার "পহুঁ" অর্থে "পুনঃ"ই ধরিয়া লইতে হইবে, এবং স্থির করিতে হইবে এরূপ ক্রিয়াহীন অসম্পূর্ণ পদবিন্যাস গোবিন্দদাসের একটি বিশেষত্ব ছিল। "গোবিন্দদাস পহুঁ" অর্থাৎ "গোবিন্দদাস পুনশ্চ বলিতেছেন" এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। গোবিন্দদাসের স্থানে স্থানে "পহুঁ" শব্দের পরে ক্রিয়ার যোগও দেখা যায়। যথা—"গোবিন্দদাস পহুঁ এইরস গায়।" অর্থাৎ গোবিন্দদাস পুনশ্চ এই রস গান করেন।

পাঠকেরা আপত্তি করিতে পারেন এরূপ স্থলে পুনঃ অর্থের বিশেষ সার্থকতা দেখা যায় না। কিন্তু প্রাচীন কবিদিগের পদে একপ্রকার অনির্দ্দিষ্ট অর্থে পুনঃ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যথা—"তুহারি চরিত নাহি জানি, বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি।" "রাধামোহন পুন তুঁহি ভেল বঞ্চিত।" "গোবিন্দদাস কহই পুন এতিখনে না জানিয়ে কী ভেল গোরি।"

যাহা হউক, গোবিন্দদাস কখন বা ক্রিয়াপদের সহিত যোগ করিয়া কখন বা ক্রিয়াপদকে উহ্য রাখিয়া পহুঁ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু সেই সেই স্থলে পহুঁ অর্থে পুনঃই বুঝিতে হইবে। অন্য কোনরূপ আনুমানিক অমূলক অর্থ কল্পনা করিয়া লওয়া সঙ্গত হয় না।

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি আমার কোন শ্রদ্ধেয় পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে তাঁহাদের দেশে "নিছে-পুঁছে" শব্দের চলন আছে। এবং নব বধূ ঘরে আসিলে তাহার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে "নিছিয়া" লওয়া হয়। অত-এব এরূপ চলিত প্রয়োগ থাকিলে "নিছনি" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সংশয় থাকে না।

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। বৈশাখ। পুরাতন ও নূতন। লেখক মহাশয়ের বক্তব্য এই যে, নূতন আসে এবং পুরাতন যায়—কিন্তু হায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই বিশ্বব্যাপী নিয়মের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পদের পর পদ আসিতেছে, কিন্তু পুরাতন কথাও ঘুচে না নূতন কথাও জুটে না। কোন কোন মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন কথা ব্যতীত ভাবা অসম্ভব, সে কথা কত দূর সত্য বলিতে পারি না, কিন্তু দেখা যাইতেছে আমরা কিছু মাত্র না ভাবিয়াও অনর্গল কথা কহিয়া যাইতে পারি। অনেক স্থলে, কথা কীটের মত অতি দ্রুতবেগে আপনার বংশবৃদ্ধি করিয়া চলে, ভাবের জন্য অপেক্ষা করে না। যদি একবার দৈবাৎ কলমের মুখে বাহির হইল—"নূতনের ধারে পুরাতন থাকে না" অমনি তাহার পর আরম্ভ হইল "বৃক্ষে নূতন পত্রের উদ্গম হইলে পুরাতন পত্র খসিয়া পড়ে।" তস্য পুত্রঃ "নূতন ফুল ফুটিতেছে দেখিলে পুরাতন ফুল ঝরিয়া পড়ে।" তস্য পুত্রঃ "নবীন সূর্য্য উঠিতেছে দেখিলে চাঁদ পালায়।" তস্য পুত্রঃ "নব বসন্ত আসিতেছে দেখিলে শীত অন্তর্দ্ধান হয়।" তস্য পুত্রঃ "নূতন বন্ধুর উদয়ে পুরাতন বন্ধু লজ্জায় মুখ নত করিয়া চলিয়া যায়।" (মানবের সৌভাগ্যক্রমে পুরাতন বন্ধুর এরূপ অকারণ অতিলজ্জাশীলতা সচরাচর দেখা যায় না।) তস্য পুত্রঃ "নূতন বৎসর আসিতেছে দেখিয়া পুরাতন বৎসর থাকিবে কেন?" অবশেষে "৯৯ উদয়ে ঐ দেখ ৯৮ সাল কালের গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে।" এতক্ষণে কারণটা পাওয়া গেল—নববর্ষ আসিয়াছে,